# আক্ষেপ

**- মিতু**

আমি তখন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। পড়ার চাপ কম থাকাতে মনে মনে চিন্তা করলাম সিলেটের চা বাগান এবং পাহাড়কে নিজ চোখে এবার দেখে আসবো। বড়আপু তখন সিলেটে। দুলাভাইয়ের চাকরির সুবাদেই তারা ওখানে ছিলেন।

নিজ চোখে চা বাগান দেখার খুব শখ আমার। সেই সঙ্গে ট্রেন ভ্রমণেরও একটা সুপ্ত বাসনা ছিল।

আমার ভাই রাশেদ, বোন টুনি এবং খালাতো ভাই সুমনকে রাজি করালাম সিলেটে যাবার জন্য।

পথের কাটা হলেন অভিভাবকরা। তারা দুটো মেয়েকে কিছুতেই পুচকে ছেলে দুটোর হেফাজতে দিতে চাইলেন না।

অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরে রাজি করালাম।

তারা তিনজন বাসের টিকেট কাটতে চাইলো।

আমার শখের জয় হলো। ট্রেনের টিকেট কাটা হলো। প্রায় সাড়ে সাতশ টাকার টিকেট।

যথাসময়ে আমরা সবাই রেডি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, তখন আমার দুটো ছাত্র ছিল। যেহেতু বেশ কিছুদিন পড়ানো হবে না, তাই তাদের কিছু হোম ওয়ার্ক দিয়ে আসতে চাইলাম।

তারা তিনজন রাজি হলো। ছাত্রছাত্রী দুটোকে লেখাপড়া বুঝিয়ে দিতে দিতে বেমালুম ভুলে গেলাম ঢাকা শহরের কুৎসিত যানজটের কথা। ভেবেছিলাম হাতে আধ ঘণ্টা সময় বেশি থাকলেই চলবে। যেহেতু তারা কেউ আমার ছাত্রছাত্রীর বাড়ি চিনতো না, তাই কেউ খবরও দিতে পারলো না। বাড়ি পৌছাতে প্রায় পৌনে একটা বেজে গেল। ট্রেন ছাড়ার সময় দেড়টায়।

বাড়িতে সবার বকাঝকা খেতে খেতে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দেয়া শুরু করলাম। সারাটা আনন্দই বুঝি মাটি হলো। কোনো রিকশাচালকই কমলাপুর রেলস্টেশনে যেতে চাইলো না যানজটের জন্য।

কোনো রকম একটা বেবিট্যাকসি জোগাড় করে অনেক যানজট এবং চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে কমলাপুরে নেমেই যার যার ব্যাগ নিয়ে একশ মাইল বেগে ট্রেনের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে লাগলাম।

কিন্তু হায়! মাত্র দুই মিনিট আগে ট্রেন ছেড়ে গেছে। তাদের তিনজনের বকাবৃষ্টি পড়তে লাগলো আমার শরীরে।

আমার কাছে এক হাজার টাকা ছিল। বললাম পরবর্তী ট্রেনের টিকেট কাটতে।

কপাল মন্দ! কোনো টিকেট পেলাম না। শেষে সবার টাকা মিলিয়ে বাসের টিকেট কাটা হলো।

সারাটা পথ শুধু তাদের বকা হজম করেছি।

তাদের কষ্ট হচ্ছিল টাকার জন্য। আমার কষ্ট হচ্ছিল প্রথম ট্রেন ভ্রমণ না করতে পারার জন্য।

অনেক পরে অবশ্য ট্রেনে চড়ে চট্টগ্রাম গিয়েছি। কিন্তু সেই ট্রেন ভ্রমণ না করতে পারার আক্ষেপটা আজও থেকে গেছে।

*নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে*

# জাতের মেয়ে কালো ভালো

- শামসুল হক হাওলাদার

বাড়ি আমার বিক্রমপুর। ঢাকা থেকে বেশি দূরে নয়। চারদিকে নদীবেষ্টিত থাকায় এখানে কোনো রেললাইন নেই। তাই আমরা বিক্রমপুরীরা সহজে রেলগাড়ি চড়তে পারি না। আমাদের যাতায়াত বেশির ভাগই হতো লঞ্চে। চারদিকে নদী থাকায় লক্ষণ সেন বিক্রমপুরে পালিয়ে এসে তার রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন।

সে যাই হোক। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার আগ পর্যন্ত রেল চোখে দেখিনি। এর আগে শুধু *পথের পাঁচালী* পড়ে অপুর চোখে রেলগাড়ি দেখেছি। তারপর একবার জীবনে প্রথম রেলগাড়ি দেখার জন্য গেলাম কমলাপুর রেলস্টেশনে। গেট ফাকা পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভেতরে ঢোকার সময় কেউ কিছু বলেনি। পুরো প্ল্যাটফর্ম ঘুরে ফিরে দেখে যখন বের হবো তখন ঘটলো আসল বিপত্তি।

যাত্রীরা লাইন ধরে বের হচ্ছে। টিকেট চেকার এসে আমার টিকেট চাইলো।

বললাম, আমি রেলে চড়ে আসিনি। আমি এখান থেকেই ভেতরে ঢুকেছিলাম।

তাদের বোঝাতে ব্যর্থ হলাম। তারা আমার কথা বিশ্বাস করলো না।

তার বললো, হয় ভাড়া দাও, নয় তো তোমাকে পুলিশে দেবো।

আমার জানা আছে *বাঘে ছুলে আঠারো ঘা* আর *পুলিশে ছুলে দফারফা*। শেষে জরিমানা দিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম।

অন্যদিন কমলাপুর গিয়ে অন্য রকমের এক ঝামেলা হলো।

তবে সেদিন রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের খুব সহযোগিতা করেছিল।

আমার বন্ধু পত্রিকায় চাকরি করে। যৌবনে বহু মেয়ের প্রেমসুধা পান করে মাঝখানে ডুব দিয়েছিল। সবাই ভাবছিল সে আর প্রেম প্রেম খেলায় নেই। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় সে এসে বললো, দোস্ত, আগামীকাল আমার বিয়ে।

শুনে তো চোখ চড়ক গাছ। বলে কি! এক সঙ্গে থাকি, অথচ আগামীকাল তার বিয়ে কিছুই জানি না!

শেষে যা বললো তার অর্থ হলো, পত্রিকায় চাকরির সময় এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। মহিলা গুণের আছে। কিন্তু কিছুটা রূপের ঘাটতি থাকায় যৌবনে তার বিয়ে হয়নি।

আমার বন্ধু আবার সর্বভুক প্রেমিক। তার কথা হলো, মেয়ে হলেই হলো। যেখানে প্রেমে পড়তো, কিছুদিন পর ছ্যাক দিয়ে ছেড়ে দিতো। সেখানে এবার এই মহিলা তাকে কব্জা করে ফেলেছে। ছুটে পালাতে পারেনি। এখনি বিয়ে করতে হবে এই শর্তে সে ছাড়া পেয়েছে। তাই আগামীকাল বিয়ে।

আমার বন্ধু বললো, এখন সময় নেই। চল, কমলাপুর স্টেশনে যেতে হবে। মা-কে ফোন করেছি, তারা আসবে। তাদের বাসায় রেখে অন্য সব কাজ সারতে হবে।

আমরা কমলাপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছি। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এলো। ট্রেন থেকে নেমে এলো শুধু ওর তিন বোন। ওর মাকে দেখলাম না।

বন্ধু বললো, মা কোথায়?

ওর এক বোন বললো, মাঝখানে এক স্টেশনে ট্রেন থামলে একটু নেমেছিলেন আর উঠতে পারেননি। তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এখন বুদ্ধি করে যদি অন্য ট্রেনে উঠে চলে আসে তাহলেই রক্ষা। নতুবা আবার ঝামেলা।

কমলাপুর রেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খোজ নেয়া হলো সেই স্টেশনে। তারা জানালো, হ্যা, এমন এক ভদ্রমহিলাকে তারা পরের ঢাকার ট্রেনে তুলে দিয়েছে। তিনি আসছেন ঢাকায়।

তারপরও বন্ধু আমার নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। ঢাকা রেল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী স্টেশনে ফোন করে বন্ধুর মাকে খুজে বের করে ফোনে কমলাপুর তার ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিল।

এতোসব তারা করলেন একজন সাংবাদিকের মা বলেই।

শেষে বন্ধু আমাকে বললো, তুমি আমার বোনদের নিয়ে বাসায় যাও। আমি মাকে নিয়ে আসছি।

রাত তখন প্রায় একটা। আমরা দুই রিকশায় ভাগ হয়ে চলেছি। রিকশায় যেতে যেতে অনেক কথা হলো। হঠাৎ বিয়ে কেন, পাত্রী দেখতে কেমন ইত্যাদি।

আমি এর কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

ওর বড় বোন বললো, দেশে কতো সুন্দর সুন্দর মেয়ের অফার এসেছিল, কিন্তু ভাইয়া বিয়েতে রাজি ছিলেন না। এখন কাউকে না বলে দেখি কোন রূপসীকে তিনি বিয়ে করছেন।

বন্ধুর বোন বড়টা কলেজে পড়ে, ছোট দুটো স্কুলে।

পরদিন বিয়ে।

বন্ধুর মা বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়ে দেখে সেই যে ফিট হয়ে পড়লেন আর চোখ খুললেন না।

তাকে নিয়ে বন্ধুর বাসায় চলে এলাম। রাতে যখন সব ঝামেলা শেষ তখন বন্ধুর মা আবার ডুকরে কেদে উঠলেন, একি করলি রে?

বন্ধু মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, মা, আমার বিয়ে না করে কোনো উপায় ছিল না। বিয়ে না করলে পরদিন পত্রিকায় খবর উঠতো *সাংবাদিকের কাণ্ড*। মেয়ের গায়ের রঙ কালো। কিন্তু জাতে ভালো। কথায় বলে *নদীর পানি ঘোলা ভালো, জাতের মেয়ে কালো ভালো*।

*কুসুমপুর, মুন্সীগঞ্জ থেকে*

# বিনা টিকেটে পঞ্চাশ ঘণ্টা

**- শামসুল আলম**

১৯৯০ সালে আমার প্রয়াত বাবার টাকা মেরে একবার ইনডিয়াতে গিয়েছিলাম। এখানে বলে রাখা ভালো, আমার বাবার টাকা মারতে আমাকে খুবই কষ্ট করতে হয়েছিল। তারপর এক পকেটমার তার আধুনিক টেকনিক কাজে লাগিয়ে আমাকে প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কি? আমি দিল্লি যাবোই।

কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে বিনা টিকেটে দিল্লিগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। টিকেট না থাকায় কোনো সিট পেলাম না।

অন্য অনেক যাত্রীর সঙ্গে আমিও দাড়িয়ে। এভাবে পাচ ছয় ঘণ্টা ট্রেন চলতে চলতে মাঝখানে এক স্টেশনে ট্রেন থামলো। নেমে পড়লাম। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলে উঠে পড়লাম। উঠেই বিপত্তি। টিকেট চেকারের হাতে ধরা পড়ে নিজের বাকি দুইশ রুপি থেকে দেড়শ রুপি দিয়ে এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম।

এরপর দীর্ঘ বিশ ঘণ্টা ট্রেন চলার পর নতুন দিল্লি স্টেশন নেমে পড়লাম। এদিকে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় আমি দিশাহারা। দিল্লি জামে মসজিদের বারান্দায়ও রাত কাটানোর কোনো রকম স্থান না পেয়ে একটি নিম্নমানের হোটেলে পচিশ রুপি দিয়ে কোনোভাবে রাত কাটালাম।

পরের দিন কোনো উপায় না দেখে আবারও দিল্লি স্টেশন থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। আবারও চেকারের হাতে ধরা পড়ার পর তাকে আমার পাসপোর্ট দেখিয়ে বললাম, আমার রুপি হারিয়ে গেছে। আমি একজন পর্যটক। বাংলাদেশে চলে যাচ্ছি।

এ যাত্রায় রক্ষা হলো।

প্রায় বিশ ঘণ্টা যাত্রা শেষে কলকাতা হাওড়া স্টেশনে নামলাম। আবার বনগাওগামী ট্রেনে চড়লাম। চার পাচ ঘণ্টা ট্রেন চলার পর বনগাওয়ে যখন নামলাম, টিকেট মাস্টার আমার টিকেট না পেয়ে একটি খালি রুমে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আমি গোয়েন্দা কি না। শেষে কোনো তথ্য না পেয়ে আমার পাসপোর্ট দেখে ছেড়ে দিল। হাতঘড়িটা নিতে চাইলেন। কি মনে করে আবার নিলেন না।
এভাবে আমার জীবনের প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণে শেষ হলো।

*সউদি আরব থেকে*

# জাংশনে একা

**আর.এ জামাল**

লাবণ্য চিঠি লিখেছে। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র আমেরিকা প্রবাসী এক ধনকুবের। দেখতে শুনতে স্মার্ট, সুদর্শন। তবু ওর এমন বর পছন্দ নয়। অজানা-অচেনা একটা লোকের সঙ্গে চিরদিনের গাটছড়া বাধতে হবে এটা সে মানতে নারাজ। চিঠিতে আরো লিখেছে, যেকোনো একদিন তোর ঠিকানায় গিয়ে উঠতে পারি। তুই প্রস্তুত থাকিস।

সেই থেকে অমিত প্রতিদিন বেলা একটা হতে আড়াইটা পর্যন্ত রেল জাংশনে এসে দাড়িয়ে থাকে। অমিত-লাবণ্য দুজনে ইউনিভার্সিটিতে একত্রে লেখা পড়া করেছে। ইউনিভার্সিটি পড়ুয়াদের বেলায় মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলার রেওয়াজ অনেক আগেই উঠে গেছে। যে যার চলা-ফেরায়, কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বুঝে নেয় কে কাকে ভালোবাসে, কে কাকে বন্ধু ভাবে। অমিত ও লাবন্যের বেলায়ও তেমনি।

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর পর পরই চাকরিটা জুটে যায় অমিতের। পাবর্তীপুরে চলে আসে অমিত চাকরির সুবাদে। প্রথম প্রথম যোগাযোগ থাকলেও এখন কমে গেছে। আর সেটা লাবণ্যের কারণেই। অমিত তিনটা চিঠি লিখলে লাবণ্য উত্তর লেখে একটার। এভাবেই যোগাযোগটা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ দিন পর এ চিঠি লিখেছে লাবণ্য।

অমিত জানে লাবণ্য কি পছন্দ করে আর কি অপছন্দ করে। লঞ্চ জার্নি ওর দারুণ পছন্দ। বাস জার্নি ওর একদম অপছন্দ। হাত-পা কুজো হয়ে বসে, তবে কু ঝিক ঝিক শব্দটা শুনলে ওর মাথা ধরে যায়। ঘন ঘন লঞ্চ দুর্ঘটনায় লঞ্চ জার্নির প্রতি এক প্রকার ভীতি জন্মেছে ওর মনে। তাই ট্রেন জার্নি এখন ওর একমাত্র পছন্দ। ওর অনেক দিনের স্বপ্ন জীবন সঙ্গীকে নিয়ে কলকাতার পাতালট্রেনে চড়বে। জাপানের হাওয়াই টেনে চড়বে, ট্রেনে চড়ে সারা ইনডিয়া দেখবে, আরো কতো কি...!

অমিতও মনে মনে লাবণ্যের পাশে লাবণ্যের জীবন সঙ্গিনী বেশে কল্পনার রথে চড়ে বেড়িয়েছে সারা বিশ্বের তাবৎ ট্রেনগুলোতে।

পাবর্তীপুর জাংশনে এখন লোকে লোকারণ্য। কথা-বার্তা, চিৎকার-চেচামেচিতে স্টেশনটি সরগরম। এইমাত্র ট্রেন থেমেছে। যাত্রীরা নামছে-উঠছে। অমিত প্রথম শ্রেণীর জানালার কাছে উকি-ঝুকি মারে। চোখ দুটি খোজে তার একটি মানুষকে, একটি প্রিয় মুখ। কোনো কোনো দিন বিভ্রান্ত হয়।

ট্রেনের বগিতে স্বল্প আলো-অন্ধকারে দুই একজনকে লাবণ্য ভেবে ভুল করে। এক পলক দেখেই লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেয় অমিত। যাত্রীরা কি ভাবে তাকে, হ্যাংলা নাকি অপদার্থ! দুই একজনের চেহারা লাবণ্যের সঙ্গে এতো বেশি মিলে যায় যে, লাবণ্য ভেবে ভ্রম হয়। পরক্ষণেই ভুল ভাঙে। চকিত ভুলে বুকটা ধক করে ওঠে। পরক্ষণেই হতাশায় বুকটা ভেঙে যেতে চায়। মনের মাঝে যে ছবি আকা থাকে, চোখ বুঝি ভুল করে পৃথিবীর সব নারীর মুখ সে রকমই দেখে। অমিতের তা-ই মনে হয়।

ট্রেন চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। অমিত তখনো দাড়িয়ে আছে। কোলাহল থেমে গেছে। জাংশনটি এখন নির্জন বাড়ি–ঘরের মতো শান্ত লাগে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অমিত ফিরে যায়।

পরদিন কাজ সেরে আবার আসে। লাবণ্য আসে না। তবে কি প্রবাসী লাবণ্যর মন জয় করে নিয়েছে? কথাবার্তায়ই তো মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসী হয়তো প্রতিদিন লাবণ্যর অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে কথা বলিয়েছে। এ জোরটুকুতেই মেয়েদের ভরসা। এ জোরটুকুই বুঝি মেয়েরা ভালোবাসে। স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের প্রভাব খাটানো, জোর খাটানো একটা অলিখিত অধিকার। মায়েরাও এটা পছন্দ করে। কিন্তু অমিত কোনোদিন এটা পছন্দ করে না। কিন্তু লাবণ্য তো সেই মায়েরই জাত। তার ভেতরেও সেই প্রভাব খাটানোর লোকের প্রতি ভালোবাসাটা সহজাতভাবে এসেছে। কে জানে?

এমনি করে অমিত প্রতিদিন জাংশনে আসে–যায়। লাবণ্যর সেই একদিন চলে আসা হয় না। বিয়ের স্থির করা দিন গতকাল চলে গেছে। তবু অমিত আজও এসেছে। ভুলক্রমে যদি বা লাবণ্য এসে তাকে না পেয়ে ফিরে যায় এই ভয়ে।

ট্রেন আজও তাকে নিরাশ করে ফিরে চলে গেছে। এতোদূরে গেছে যে হুইসলও শোনা যায় না।

শুধু অমিতের মনের গহনে তপন চৌধুরী গেয়ে চলেছে –

*ট্রেন চলে গেছে*
*স্টেশনটা ফাকা*
*নির্জন, নিশ্চুপ, মৌন প্রাণে*
*স্টেশনের মতো আমি একা।*

*চরফ্যাশন, ভোলা থেকে*

# চলমান প্রশ্ন

**- দিলারা জাহান মিতু**

গত বছরের শেষে সবেমাত্র এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। ক্লাসও হচ্ছে লোকাল বাসের মতো। সব কিছু কেমন যেন নতুন মনে হচ্ছিল। এমন সময় কি যে খেয়াল চাপলো, একাই খুলনা বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হলো।

জীবনে প্রথম অভিভাবক ছাড়া ভ্রমণ করবো ভেবে খুব আনন্দই লাগছিল। সিদ্ধান্ত নেয়ার পরের দিনই কলেজে না গিয়ে এবং কারো কোনো কথা না শুনেই নানুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে সোজা ঝিকরগাছা রেলস্টেশন।

টিকেট কেটে ট্রেনের অপেক্ষা করছি। তখন কিছুটা নার্ভাস ফিল করলেও তা কাটানোর জন্য নিজেকে আশ্বাস দিলাম যে, জীবনের দীর্ঘ পথ তো আমাকে একা পাড়ি দিতেই হবে। নার্ভাস হলে চলবে না।

খুলনা–বেনাপোল ট্রেন আসতে প্রায়ই দেরি করে। সেদিনও আধঘণ্টা লেট। রোদে দাড়িয়ে থেকে মেজাজটা খিচড়ে আছে। ট্রেনচাচা এলো। অনেক ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে উঠতে হলো।

কিন্তু একি! কোথাও বসার জায়গা নেই। কি করা! দাড়িয়ে রইলাম।

যশোর স্টেশনে ট্রেন থামলে সিট খালি হওয়ায় বসলাম। এবার ট্রেনের চারদিকে একটু খুটিয়ে দেখতে থাকলাম। এতো নোংরা। আর বাথরুমের কথা বাদই দিলাম। উঠেছিলাম ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে। কিন্তু মনে হলো এই ট্রেনে ফার্স্ট ও লাস্ট বলে কিছু নেই। সবই এক।

কিছু মহিলা ও লোক চিনি এবং আপেলের বস্তা দিয়ে যাতায়াত পথ রোধ করে আছে। তাদের দেখে ও কথা শুনে বুঝতে পারি তারা অবৈধভাবে এগুলো ইনডিয়া থেকে বাংলাদেশে এনেছে।

এক পর্যায়ে একজন মহিলা ও একজন লোকের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তারপর হাতাহাতি মারামারি। লোকটি যতোটা না মারছে তারচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে। এক সময় মহিলাটি লোকটির জামা ছিড়ে দেয়।

ট্রেনে যখন এমন অবস্থা, সবাই বসে বসে আঙুল চুষছে এবং মজা দেখছে। যেন এটি একটি সিনেমা হল এবং খুব মজাদার কোন হিট সিনেমা চলছে।

অবশ্য সিনেমাই বলা যায়। কারণ সরকার যাদের পুষছে জনগণের জন্য তারা অর্থাৎ সেই পুলিশ মহাশয়ের একজন সেদিন ওই বগিতে কর্তব্যরত ছিলেন। তিনি আমার সামনের সিটে বসে সিনেমা দেখছিলেন।

এক সময় সেই মহিলাটি পুলিশটির কাছে এসে কান্না শুরু করে। পুলিশটি তাকে সান্ত্বনা দেন এবং মহিলাটির সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মতো আচরণ করেন। কারণ ঝগড়া শুরু হওয়ার কিছু আগে মহিলাটি তার অর্থাৎ পুলিশটির মানিব্যাগের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি করেছে।

ঝগড়া শেষ হওয়ার কিছু পর সেই মহিলাটি পুলিশটির পাশের সিটে বসে এমন ইয়ার্কি শুরু করে যেন তাদের সম্পর্ক শ্যালিকা ও দুলাভাই।

এতো দিন শুধু জেনে এসেছি পুলিশরা *অমানুষ*। সেদিন বাস্তবে আমার অভিজ্ঞতা হলো।

মনে করেছি ট্রেন ভ্রমণটা উপভোগ্য হবে। কিন্তু হলো বিরক্তিকর। সেদিন আমার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল এই সমাজকে, সমাজের মানুষকে আর যারা রক্ষক হয়ে ভক্ষণ করে তাদেরকে।

এই সমাজ আমাদের প্রতিবাদী হতে শেখায়নি। শিখিয়েছে ভয়ে সিটিয়ে থেকে মজা দেখতে।

প্রশ্নগুলো সারা পথ আমার মনে উকি দিচ্ছিল। কেন যেন নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। বেলা আড়াইটায় ট্রেন খুলনা রেলস্টেশনে থামলো। কিন্তু আমার মনের প্রশ্নগুলো থামলো না।

*কাউরিয়া, যশোর থেকে*

# ২৪ ঘণ্টা

**- আবদুর রহিম**

রাত দুইটার দিকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলাম এক শব্দ শুনে।

ভয়ে আম্মু, আম্মু বলে ডেকে উঠলাম। পাশে শোয়া আছেন নানাভাই। নাক ডাকছেন। তিনি ও ঘরসুদ্ধ সকল লোক জেগে উঠলেন। সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন, কি হলো?

আম্মু এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কি হয়েছে আব্বু? ভয় পেয়েছো?

না আম্মু, বিকট শব্দ শুনলাম, কি ওটা? শুনে ভীষণ ভয় লেগেছে।

এ কথা শুনে ঘরসুদ্ধ মামা, খালারা সকলেই হেসে খুন। নানুতো বলেই বসলেন, *আর ভাই তো ওনেই ডরাই গেছে, বাইন্যা (বাকি) জিন্দেগি কেন্নে কাড়াইবো।*

তবুও ওই একই প্রশ্ন, ওটা কি ছিল? সেজ খালা কোলে নিয়ে বললেন, ওটা রেলগাড়ি। এখন চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো।

ঘটনাটি ১৯৯০ সালের। বাবা মাসহ সকলে মিলে প্রবাস থেকে দেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুদিন গ্রামের বাড়ি এবং পরে একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে নানাবাড়ি থেকে গেছি আব্বু ছাড়া আমরা সকলেই। তার বিশেষ কাজ ছিল বলে থাকতে পারেননি।

দাদাবাড়ি থেকে নানাবাড়ি তেমন দূর না হলেও আমার দাদাবাড়ির পাশে কোনো রেলপথ নেই। আর সন্ধ্যায় এসেছি বলেও রেলগাড়ির চলাচলের শব্দ বিভিন্ন কোলাহলের ভেতর চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাই রাতের নিস্তব্ধতা চিরে আসা হর্নের শব্দটি শুনে ভয় পেয়েছিলাম।

পরের দিন সকালেই ছোট মামাকে নিয়ে রেলগাড়ি দেখতে গেলাম। দেখেই রাগ উঠলো নিজের ওপর। এ যে রেলগাড়ি নয়, একে তো আমার স্কুলে ট্রেন বলে। যদিও এ দেশে ট্রেন নেই।

শুনে মামা হেসে বললেন, ইংরেজিতে একে ট্রেন বলে আর বাংলায় বলে রেলগাড়ি।

ব্যাস, হয়ে গেল পরিচয়। তারপর অনেক সুযোগ খুজেছি রেলগাড়িতে চড়ার। কিন্তু সময়ের অভাবে তা আর হয়ে উঠলো না। ফিরে এলাম প্রবাসে।

স্থায়ী বসবাসের লক্ষ্যে ফিরে এলাম ১৯৯৫ সালে। এরপর থেকে সুযোগ খুজতে খুজতে অবশেষে প্রাপ্ত বয়সে সে সুযোগ মিললো। ২০০১ সাল, তারিখ মনে নেই। দেশে নির্বাচনে টিকেট প্রার্থীদের অপেক্ষার পালা শেষ হবে। নিজ নিজ দল থেকে তারা মনোনয়ন পাবেন। যারা পাবেন না, স্বভাবতই তাদের মন ক্ষুণ্ন হবে।

তখন ঢাকায় ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি। হঠাৎ কি জানি মনে করে আমার স্থানীয় অভিভাবক খালুকে বলে বসলাম, ট্রেনে করেই বাড়ি যাবো।

তিনি নিষেধ করলেন। প্রশ্ন করলে কোনো জবাবও দিলেন না।

তবুও সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি আজ ট্রেন চড়বো–ই। ব্যাগ উচিয়ে বের হয়ে পড়লাম কমলাপুরের উদ্দেশ্যে নানান ঝামেলা পেরিয়ে। গিয়ে দাড়ালাম কাউন্টারে এবং টিকেট কেটে অপেক্ষা শুরু। তিনটায় ট্রেন ছাড়বে। আড়াইটা বাজলেও ট্রেনের খবর নেই। রেল বিভাগের যখন গুষ্ঠি উদ্ধার করছি তখনই হুইসল বাজিয়ে প্ল্যাটফর্ম স্পর্শ করলো বহু কাঙ্ক্ষিত চট্টগ্রামগামী ট্রেন যার নাম *গোধুলী*।

ট্রেন আসামাত্রই প্ল্যাটফর্ম ভর্তি মানুষের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিলে এলো। সবাই *ঠেলাঠেলি* শুরু করে দিয়েছে। বহু কষ্টে বগিতে ঢুকে জানালার পাশে নিজের সিট নাম্বার দেখে কি যে খুশি হয়েছিলাম তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

আমার সামনের সিটেই বসলেন এক গুণ্ডা মার্কা লোক। তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছি। কেমন জানি একটা দৃষ্টি ছিল তার চোখে। আমার হাতে তখন কমপিউটার বিষয়ক একটি ম্যাগাজিন ছিল E-biz। মজার ব্যাপার হলো, প্রচ্ছদে একটি আকর্ষণীয় মেয়ের ছবি ছিল। লক্ষ্য করলাম লোকটি বার বার ওই প্রচ্ছদের দিকেই দেখছে।

ট্রেন শেষ হুইসল বাজিয়ে ছেড়ে গেল। চলতে শুরু করলো রেলগাড়ি এবং শুরু হলো আমার প্রথম রেলপথ যাত্রা।

মৃদু ঝাকুনিতে তন্দ্রা আসছিল বার বার, তবুও ঘুমাচ্ছিলাম না পাছে জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়! আবার সামনে গুণ্ডা মার্কা লোকটি বসা। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হলো।

এভাবে আমরা নরসিংদী এসে পৌছালাম এবং গতি থামিয়ে হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। পত্রিকার পাতা থেকে চোখ তুললাম। মনে পড়লো নরসিংদীতে ট্রেন থামার কোনো কথা নয়। কেননা এ ট্রেন নরসিংদী থামে না। সেকেন্ড থেকে মিনিট, এবার ঘণ্টা। ব্যাপার কি? ট্রেন যে আর নড়ছে না।

এবার বগিতে লাগানো স্পিকারে ঘোষণা এলো, ভৈরবে স্থানীয় নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় তার সমর্থকেরা রেললাইন উপড়ে ফেলেছে। উপড়ানো রেললাইন ঠিক হতে রাত দুই তিনটা অথবা সকাল দশটাও হতে পারে। ভৈরবের যাত্রীরা পেছন থেকে আসা *সুবর্ণ এক্সপ্রেস*–এ যেতে পারেন, বাকিজনেরা ট্রেনে বসলেও বসতে পারেন। কেননা ট্রেন ঢাকার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরতি পথ ধরবে।

সমস্ত স্পৃহা নষ্ট হয়ে গেল। মনে পড়লো কেন খালু আমাকে আসতে নিষেধ করেছিলেন। এবার যদি ঢাকায় ফেরত যাই তবে অনেক বকা খেতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুবর্ণ এক্সপ্রেস এলো এবং যাত্রীরা লোকাল বাসের মতো ইঞ্জিনেও এসে বসলো।

আমি উঠলাম না, ভৈরব গিয়ে কি হবে? আমি তো কিছুই চিনি না।

সাতপাচ ভাবতে ভাবতে দেখি চার সদস্যের এক পরিবার বগিতে বসে আছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কই যাবা।

জবাবে বলি ফেনী।

কি বুঝে বললেন তাদের ভৈরব পর্যন্ত পৌছে দিতে।

আমার জবাব, কিছুই চিনি না।

তবুও তারা বললেন, যেতে হবে।

কি ভেবে রাজি হলাম। এবার শুরু হলো অন্য রকম ভ্রমণ।

রিকশায় পৌছালাম নরসিংদী সদর। তারপর মাইক্রোবাসে করে ভৈরব। লম্বা কাহিনী। অপ্রত্যাশিতভাবে মহিলা তার মেয়ের বাসায় উঠলেন। আসলে তাদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মেয়েরা ভীষণ বড়লোক। ভৈরব বাজারে আড়ত আছে।

অত্যন্ত যত্ন সহকালে আপ্যায়ন করলেন এবং সকালে তাদের গাড়ি দিয়ে আশুগঞ্জগামী ফেরিতে তুলে দিলেন। প্রথম রেলযাত্রার সঙ্গে প্রথম ফেরিযাত্রাও ছিল বোনাস প্রাপ্তির মতো। ফেরি করে আশুগঞ্জ পৌছালাম। পরে বেবিট্যাকসি যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছালাম এবং ওখান থেকে চট্টগ্রামগামী বাসে উঠে বসলাম। ভাগ্যিস পকেটে অনেক টাকা ছিল। তা না হলে...।

আমার বরাবরের অভ্যাস বাসায় না জানিয়ে ঢাকা থেকে রওনা হওয়া। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। ওই দিন বাসায় পৌছাতে দুপুর তিনটা বেজে গেল।

পাঠক, ভাবুন ট্রেনে উঠেছি আগের দিন তিনটায়, বাসায় এসে পৌছেছি পরের দিন তিনটায়।

বাসায় সকলে এ ঘটনা শুনে অবাক। পরে টেলিফোনে খালুকে জানিয়ে দিলাম। শুনে তিনি বকা দিলেন। আর সুযোগ হয়নি ট্রেন যাত্রার।

প্রবাসে এসেও মনে পড়ে যায় তাজা এ স্মৃতি। এবং মনে পড়লে শ্রদ্ধায় নত হই ওই মানুষদের কাছে যারা আমার আশ্রয় দিয়েছেন।

*আল-আইন, ইউএই থেকে*
rahim7335318@yahoo.com

## কৃতজ্ঞ

**- এম ইউসুফ আলী**

গত মে ২০০৪-এর সামার ভ্যাকেশন-এ আমরা তিন বন্ধু চিলাহাটীগামী *তিতুমীর আন্তঃনগর এক্সপ্রেস* ট্রেনে বাড়ি যাচ্ছিলাম। নির্ধারিত সময়ে আমাদের ট্রেন রাজশাহী স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করলো। আমরা তিন বন্ধু পত্রিকা পাঠে মনোযোগ দিলাম।

দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের গন্তব্যের আগের স্টেশন থেকে কলেজ পড়ুয়া এক সুন্দরী মেয়ে আমাদের পাশের আসনে বসলো। মেয়েটি ছিল খুবই আধুনিক সাজে সজ্জিত। অলক্ষ্যে মেয়েটির গায়ের ওপর চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিলাম। আর আমার দুই বন্ধু মেয়েটির সঙ্গে খোশ গল্পে মেতে উঠলো।

মেয়েটার জামা-কাপড় এতোই টাইট ও পাতলা ছিল যে, দূর থেকেও তার দেহের ভাজ ভেসে উঠেছিল। এমনকি জামার ভেতরে কি পরে ছিল সেটাও দেখা যাচ্ছিল। সে দৃশ্য যে কারো চোখে পড়ামাত্রই লজ্জায় মাথা নিচু করার মতো হবে নিঃসন্দেহে।

ট্রেন আমাদের গন্তব্য স্টেশনে এলে আমরা দ্রুত ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নামালাম।

তারপর যখন আমরা রিকশাযোগে একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম সে সময় পাশের রাস্তায় এক নারী কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেলাম।

বাচাও, বা–চা–ও।

আমরা চিৎকার শুনে লক্ষ্য করলাম দুজন বখাটে ছেলে একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ধস্তাধস্তি করছে আর মেয়েটি তাদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমরা তিন বন্ধু এ দৃশ্য দেখা মাত্রই রিকশা থামিয়ে রেখে সে দিকে দৌড়ালাম। কিন্তু ততোক্ষণে তারা মেয়েটিকে রাস্তায় ফেলে রেখে চম্পট দিয়েছে।

আমরা সেখানে পৌছালে মেয়েটি আরো ভয় পেয়ে কাপতে শুরু করে। মেয়েটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। কিছুক্ষণ আগেই মেয়েটি এবং আমরা পাশাপাশি সিটে বসে ট্রেনে এসেছিলাম।

দ্রুত বললাম, ম্যাডাম, আপনি ভয় পাবেন না। আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা এসেছি।

মেয়েটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো অল্প কিছুক্ষণ আগে তিতুমীর ট্রেনে এসেছিলেন, তাই না?

মেয়েটি শুধু মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো।

আবার প্রশ্ন করলাম, আপনার বাসা কোথায়?

জবাবে মেয়েটি তার ডান হাতের আঙুল উচু করে আনুমানিক দুইশ গজ দক্ষিণ–পশ্চিম কোণে একটি দোতলা বাসা দেখিয়ে দিল।

আমরা অমায়িক সুরে বললাম, ম্যাডাম চলুন, আপনাকে বাসায় পৌছে দিই।

বখাটে ছেলে দুটো মেয়েটির জামা–কাপড় ধস্তাধস্তি করে ছিড়ে ফেলেছিল। তাই আমাদের সামনে মেয়েটি ভীষণ লজ্জা বোধ করছিল। মেয়েটি জড়ো–সড়ো হয়ে ছেড়া জামা কোনো মতে বুক, পেট ও পিঠ ঢেকে নিল।

মেয়েটিকে পেছনে রেখে আমরা তিন বন্ধু সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম। মেয়েটির বাসার কাছাকাছি এসে আমরা বললাম, আপু, আমরা এখন আসি।

মেয়েটি শুধু লজ্জিত কণ্ঠে মাথা ঝুকিয়ে সম্মতি ও কৃতজ্ঞতা জানালো।

গত জানুয়ারি মাসের শুরুতে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। একদিন বিকেলে আমি ও আমার ক্লাসমেট কাউসারসহ ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন ট্রেন স্টেশনের পাশে ভাপা পিঠা খাচ্ছিলাম। সে সময় স্টেশনে একটি ট্রেন প্লাটফর্মে দাড়িয়েছিল। ভাপা খেতে খেতে লক্ষ্য করলাম, একটি মেয়ে জানালা দিয়ে মাথা বের করে আমাকে উদ্দেশ্য করে ভাইয়া ভা–ই–য়া বলে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ডাকের সাড়ায় তার নিকটবর্তী হলাম। এবং মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, সরি, আপনাকে ঠিক...।

লাবণ্যময়ী মেয়েটি ঝটপট বললো, আমি সেই মেয়ে গত বছর আপনি যাকে সম্ভ্রমহানির হাত থেকে বাচিয়ে বাসায় পৌছে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেনের হুইসল বেজে উঠলো। ট্রেন তার গতিতে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। মেয়েটি কথা বলে চলেছিল। কিন্তু তার কথার আওয়াজ আর আমার কানে পৌছাল না।

তবে শেষ কথা এতোটুকু শুনতে পেরেছিলাম, ভাইয়া, আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম।

বর্তমানে ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট সমাপ্ত। ভর্তি কার্যক্রম প্রায় শেষ। জানি না সেই কৃতজ্ঞ মেয়েটি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কি না? তবে সময়ের সন্ধিক্ষণে একদিন হয়তো বা আবার ইউনিভার্সিটির সবুজ ক্যাম্পাসে দেখা হয়ে যাবে।

*রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে*

# লোকাল

- শামীম

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানার এক পল্লিতে কেটেছে আমার শৈশব ও কৈশোর জীবন। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে চলে আসি ঢাকায়। আমাদের এলাকা থেকে ঢাকা আসতে প্রথমে লঞ্চ, পরে বাস-ট্রেন যোগাযোগের মাধ্যমে সেই সূত্রে জীবনে বহুবার ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু এতো সব ট্রেন ভ্রমণের মধ্যে যে ভ্রমণটি এখন আমার সব সময় মনে পড়ে তা আজ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র।

লেখাপড়া যাতে ভালোভাবে করি সে জন্য আব্বা একটি কথা প্রায়ই বলতেন, *লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।*

আব্বার কথায় বেশ প্রেরণা পেতাম এবং মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতাম। লেখাপড়ার মাঝে প্রায়ই ভাবতাম, যদি কোনোদিন গাড়িতে চড়তে পারতাম, ঢাকায় বেড়াতে পারতাম!

হঠাৎ একদিন আব্বা বললেন, চল ঢাকা থেকে বেড়িয়ে আসি।

আব্বার কথা শোনামাত্রই আনন্দে লাফাতে লাগলাম। ভালো একটি দিন দেখে আমি, আব্বা ও আমার ছোট ভাই লঞ্চযোগে ভৈরব এলাম। আব্বা তিনজনের জন্য তিনটি টিকেট নিয়ে এলেন।

নির্দিষ্ট সময় ট্রেন এলো। আমরা ট্রেনে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন শা শা করে ঢাকার দিকে ছুটে চললো। রাস্তার দুই পাশে খোলা মাঠ, কাচা-পাকা ধানক্ষেত, ছোট ছোট গ্রাম সব কিছু পেছনে ফেলে মাত্র দুই ঘণ্টায় এলাম ঢাকায়।

ঢাকায় পাচ দিন বেড়িয়েছিলাম। আব্বার প্রয়োজনীয় কাজ শেষে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। এরই মধ্যে শিশু পার্ক, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা এসব কিছু দেখা শেষ। এবার বাড়ি ফেলার পালা।

মাকে ছেড়ে কোথাও এতোদিন থাকিনি। তাই বাড়ি ফেরার জন্য মনটাও অস্থির হয়ে উঠেছে। শেষ দিনে আব্বা আমাদের দুই ভাইকে নতুন জামা ও জুতা কিনে দিলেন। খুশি মনে আত্মীয়স্বজন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আবারও কমলাপুর রেল স্টেশন। এখান থেকেই শুরু হলো আমার জীবনের স্মরণীয় ট্রেন ভ্রমণের দ্বিতীয় অধ্যায়।

আব্বা তিনটি টিকিট কেটে আমাদের নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে উঠে দেখি ট্রেন ভর্তি মানুষ, বসার কোনো জায়গা নেই।

আব্বা বললেন, এটি লোকাল ট্রেন, এতে নির্দিষ্ট কোনো আসন থাকে না।

আব্বা একজন লোককে কিছু টাকা দিলেন এবং লোকটি আমাদের বসার মতো একটি জায়গা করে দিলেন।

রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন ছাড়লো। কিন্তু ট্রেন আগের মতো দ্রুত চলে না। লক্কড়-ঝক্কড় শব্দ করে ট্রেন কিছুক্ষণ চলে আবার থেমে যায়।

এক ঘণ্টা পর ট্রেন যখন টঙ্গী জাংশনে পৌছাল তখন হঠাৎ ট্রেনের ভেতরের সবগুলো বাতি নিভে গেল। ফলে পুরো কামরায় নেমে এলো অন্ধকার।

কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল বিভিন্ন নারী-পুরুষের বিচিত্র ধরনের চিৎকার। একজন লোক চিৎকার করে বলতে লাগলো, *আমার আন্ডারফ্যান থেকে কে যেন দুইশ টাকা নিয়ে গেল।*

লোকটির চিৎকারে আমরা সতর্কিত হলাম এবং ব্যাগগুলো সাবধানে রাখলাম।

কিছুক্ষণ পর একজন মহিলা চিৎকার করে উঠলো, *হায়, হায়! কে যেন আমার পেডিকোটের মধ্য থেকে পাচশ টাকা নিয়ে গেল।*

এরই মধ্যে এক লোক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, *তোদের পেডিকোট থেকে যদি টাকা নিয়ে যেতে পারে তবে কেউ তোদের দুধ টিপলেও তোরা টের পাবি না।*

লোকটার এমন কথায় খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম।

যাই হোক। কিছুক্ষণ পরে লাইটগুলো আবার জ্বলে উঠলো। ট্রেনও আবার চলা শুরু করলো। আব্বার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত দুইটার দিকে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থান ভৈরব এসে পৌছালাম। আব্বা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। ট্রেন থেকে নেমে ছুটলাম লঞ্চ ধরার জন্য। আর এভাবেই শেষ হলো আমার জীবনের প্রথম ট্রেন ভ্রমণ।

*বরাগীর কান্দি, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ থেকে*

# বাবু

**- মোর্শেদ আলম**

মাত্র কয়েকদিন আগে রংপুর থেকে ঢাকা যাচ্ছি ট্রেনে। সেই প্রথম কোথাও ট্রেনে যাচ্ছি দুই বন্ধু। বাবু আর আমি।

বাবু আমার দেখা সবচেয়ে মজার ও চমৎকার একটা ছেলে। বর্তমানে রংপুর কারমাইকেল কলেজ ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

অসম্ভব রকমের দুষ্ট, চঞ্চল একটা ছেলে। রংপুর সরকারি কলেজে পড়ার সময় ক্লাসের এক মেয়েকে ওর দারুণ পছন্দ। কিভাবে কি করবে?

সব বন্ধুদের পরামর্শ নিল। কারো কথায় প্রায় পাচ ছয় মাস মেয়েটার রিকশার পেছন ঘুরলো। বেচারা আবার কারো কারো কথায় বেশ কয়েকদিন রাস্তায় রিকশা দাড় করিয়ে কথা বললো।

ব্যস, যা হবার তাই হলো মেয়েটা ওকে আর একদম দেখতে পারতো না। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা ওর বাসায় জানিয়ে দিল।

বাবুর আম্মা ওকে ভীষণ বকছেন রাগে মুখ একেবারে লাল হয়ে গেছেন।

কলেজে উঠতে না উঠতেই মেয়ের পেছনে ঘুর ঘুর শুরু করলি, তাও এই বয়সে!

অনেক কষ্টে বাবু ওর আম্মাকে থামালো।

ওর আম্মা রাগে বকবক করছেনই। কি বলবি? তুই মেয়েটাকে চিনিস না।

বাবু ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে বললো, আম্মা সেটা না।

তো কি বলবি? খুব চিৎকার করে ওর আম্মার প্রশ্ন।

ধীরে ধীরে বাবুর খুব সরল উত্তর, আম্মা প্রেমের কোনো বয়স নেই।

ব্যস, পরেরটুকু না শোনাই ভালো। বেচারার প্রেমের ওই শুরু, ওই শেষ।

বিচিত্র স্বভাবের কিছু মানুষের সঙ্গে ওর দারুণ সম্পর্ক। এদেরই একজন *মোজহার নূরী*। পেশায় কবিরাজ। বয়স আনুমানিক চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর।

এই মোজহার নূরীর বিশ্বাস পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধান তিনি দিতে পারেন না।

বাবুও ওনাকে দেখলেই এমন উদ্ভট সব প্রশ্ন করবে, হুজুর, লাদেনকে তো কেউ ধরতেই পারছে না, বলেন তো লাদেন এখন কোথায়?

মোজাহার নূরীর সপ্রতিভ উত্তর, অতো সহজে ওকে ধরতে পারবে নাকি? ওর গায়েবি শক্তি আছে, ও এখন বিড়ালের রূপ ধারণ করেছে!

তার থেকেও বড় কথা, এটা শুনে সে চোখগুলো বড় বড় করে, মুখটা এমন হা করবে, কি আশ্চর্য, একদম সঠিক উত্তর!

সব মিলিয়ে খুব মজার আর ভীষণ দুষ্ট একটা ছেলে।

এবারে ট্রেন ভ্রমণ।

সেকেন্ড ক্লাসের টিকেট। বসার এতোটুকু জায়গাও নেই। অনেক কষ্টে চাপাচাপি করে বসলাম।

খুব মজাই লাগছে। বাবুর সঙ্গে বেরুনোর এই একটা মজা, কখনো বিরক্তি আসে না। ও সব সময় খুটখাট কিছু না কিছু করবেই, আর সবই নিত্যনতুন এবং বেশ মজার।

এদিকে সময় যতো বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে ক্ষিধেটাও বাড়ছে। টাকা পয়সারও খুব টানাটানি। একটু এদিক-সেদিক হলেই বিপদ।

হালকা কিছু খেতে হবে। বাবুকে বললাম, চল ক্ষিধে পেয়েছে।

খাবার বগিতে ঢুকে বসি কোথায় বুঝে ওঠার আগেই বাবু আমার হাত ধরে টানছে।

কোণার এক টেবিলে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসেছেন। আমরা তার পাশেই বসলাম।

ওয়েটার কি খাবেন জিজ্ঞাসা করতেই বয়স্ক লোকটার প্লেট দেখিয়ে বাবু বেশ তড়িঘড়ি করে বললো, ওটাই দাও।

দ্রুত খাওয়া শেষ করলাম।

বাবু চোখ মেরে ইশরায় আমাকে উঠে যেতে বললো।

খুব ভয় পেলেও উঠে গেলাম।

পর পরই বাবুও উঠলো।

(বয়স্ক লোককে ইঙ্গিত করে) ওয়েটারকে নিজে থেকেই বললো, চাচার খাওয়া শেষ হতে অনেক দেরি, এই ফাকে আমরা সিগারেট খেয়ে আসি।

ওয়েটারের মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি লক্ষ্য করলাম।

দ্রুত বগি ফেলে এসে অন্য একটা বগিতে একটু আলাদা বসেছি। কিছুক্ষণ পরই বেশ চেচামেচি শুনছি। আড়চোখে বাবুকে দেখার চেষ্টা করছি। ওর সামনে খুব সুন্দর একটা মেয়ে বসেছে। একদম পরীর মতো।

একটু পর পর ও মেয়েটার দিকে দেখছে, মেয়েটাও মাঝে মধ্যে ওকে দেখছে।

আমার খুব ভয় করছে। বুঝতে পারছি মেয়েটার সঙ্গে বাবু কিছু একটা করবেই। মনে মনে দোয়া দরুদ পড়া শুরু করেছি। ওদিকে বেশ কয়েকজন ঘটনাটা শুনতে বেশ ব্যস্ত।

কয়েকজন আবার খানিকটা বাড়িয়ে বললো, আরো কতোগুলো ছেলে এক বয়স্ক মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে, বেচারা একটুর জন্য প্রাণে বেচেছে।

ক্রমেই আমার মাথা ভারী হয়ে আসছে আর বাবুর কোনো খেয়াল নেই। ওকে বলতে হবে। বলবো ভেবে উঠেই একেবারে চমকে গেলাম। বিশাল লম্বা, সুঠাম দেহের একজন মেয়েটার পাশেই বসলো। খুব বুঝতে পারছি, মেয়েটার ভাই নয়তো প্রেমিক জাতীয় কেউ। দাতের ওপর দাত রেখে বাবুকে দেখছে। আরো বুঝতে পারছি, ওই বয়স্ক লোকটার না হলেও এই বিশাল লম্বা ছেলেটার নির্ঘাত চড়-থাপ্পড় খেতে হবে। গলা একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে, ভাবছি কি করবো? বাবুকে মারতে শুরু করলে ছেলেটার পায়ে ধরবো। ব্যাপারটা বোধহয় বাবুও খেয়াল করেছে যে, আরেকটু পরেই ওর উচিত শিক্ষা হতে যাচ্ছে।

ব্যস, সট করে দাড়িয়ে পড়লো। চোখ দুটো একটু উপরে এক দৃষ্টিতে আর হাত দুটো দিয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করে বলছে, ছোট মামা, ছোট মামা, তুমি কোথায়?

পাঠকবৃন্দ, বিশ্বাসই করবেন না, একদম অন্ধ। সবাই বেশ অবাক। লক্ষ্য করছি সবার মুখেই সহানুভূতির চিহ্ন। হয়তো ভাবছে, এতো সুন্দর ছেলেটা অন্ধ!

ওদেরই একজন, ওর হাত ধরিয়ে ওকে সিটে বসিয়ে দিতে দিতে বলছে, তোমার মামা হয়তো একটু বাইরে গেছেন, তুমি এখানেই বসো।

ব্যস, সমস্যার সমাধান।

পাঠকবৃন্দ, হয়তো ভাবছেন নিজের বর্ণনা না করে বাবু কেন?

মানুষ এতোটা মজার হতে পারে এটা বিশ্বাস করি না। শুধু ওকে দেখলেই অবাক হতে হয়।

বাবুর জন্যই আমার ট্রেন ভ্রমণ সারা জীবন মনে রাখার মতো হয়ে থাকলো।

ভালো থাকিস বাবু।

*বুড়িরহাট, রংপুর থেকে*

# কুয়াশা ভরা রাতে

**- সাতিয়া মুনতাহা নিশা**

তখন সম্ভবত ক্লাস টু-তে পড়ি। আব্বুর সরকারি চাকরির বদলির বদৌলতে আমরা তখন গাইবান্ধায়। সেখান থেকে ঢাকা আসতে হলে প্রথমে ফেরি পার হয়ে তারপর ট্রেনে উঠতে হবে। তাই আমরা ফেরি পার হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম। আমাদের জন্য ফার্স্ট ক্লাস বগি বুক করা ছিল। আমাদের সঙ্গে বগিতে আরো দুজন ছিলেন। একজন ডাক্তার দিলীপ ধর আংকল। অন্যজন যতোদূর মনে পড়ছে সম্ভবত ডাক্তার আংকলের বন্ধু ছিলেন।

একে শীতকাল, তার ওপর আবার রাতের বেলা। তাই ট্রেনে উঠে প্রাথমিক বিশ্রাম নেয়ার পর পরই শুরু হয়ে গেল ঘুমানোর আয়োজন করার।

বরাবরের মতো ওপরের বাংকে চলে গেলাম শোবার জন্য। পাঠক লক্ষ্য করলে দেখবেন, সেখানে একদিকে ঘেরা থাকে এবং অন্যদিকে খোলা থাকে। মাথায় আঘাত পাবার ভয়ে সব সময় খোলা দিকটাতে মাথা দিয়ে শুতাম। সেদিনও তাই করছিলাম।

কিন্তু দিলীপ ধর আংকল আমাকে ওভাবে শুতে নিষেধ করলেন। কারণ হিসেবে তিনি যা বললেন তা হলো, যদি কখনো ঝাকি লাগে তাহলে ঘেরা দিকটাতে মাথা থাকলে আমি সহজেই হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবো অর্থাৎ সাপোর্ট পেতে অসুবিধা হবে না।

তার এই কথা শুনে ঘেরা দিকটাতে মাথা দিয়ে শুলাম এবং কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়েও গেলাম।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। জেগে উঠলাম প্রচণ্ড এক ঝাকি খেয়ে। চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেলাম না। চারদিকে শুধু অন্ধকার। মুহূর্তের জন্য অনুভব করলাম আমি শূন্যে ভাসছি। মনের অজান্তেই আত্মরক্ষার জন্য হাতটা সামনে বাড়ালাম। হাতটা মাথার সামনে ঘিরে দেয়া গৃলটাকে স্পর্শ করতেই প্রাণপণে সেটাকে আকড়ে ধরলাম। আমাদের বগির ভেতরে ও বাইরে থেকে প্রচুর হই চই-এর আওয়াজ পেলাম। এর মধ্যেই শুনতে পেলাম আব্বু-আম্মু আমাকে ডাকছেন। উত্তর দিয়ে জানান দিলাম যে, ঠিক আছি।

একটু ধাতস্থ হবার পর বুঝতে পারলাম কোনো একটা কারণে প্রচণ্ড ঝাকি খেয়ে ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেছে। সেই সঙ্গে বগির লাইটও পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার। আশঙ্কা বাড়তে থাকলো হয়তো বা ট্রেনে ডাকাত পড়েছে। তাড়াতাড়ি বগির দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। হঠাৎ শোনা গেল বাইরে থেকে কারা যেন ধেয়ে আসছে। তাড়াহুড়ো করে জানালাগুলো ভালোভাবে লাগানো হলো। জানালা লাগাতে গিয়ে অন্ধকারে কিছু দেখতে না

পাওয়ায় হাতে বাড়ি লেগে ডাক্তার আংকলের চশমা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। ফলে তার অবস্থা হলো আরো করুণ।

এদিকে আমি যে নেমে আব্বু–আম্মুর কাছে চলে যাবো সেই অবস্থাও নেই। গুটিশুটি মেরে ওপরেই শুয়ে রইলাম। একটু পর বগির দরজায় টোকা পড়লো। আমার তো তখন জানে আর পানি নেই। শেষ পর্যন্ত ডাকাত কি না আমাদের বগিতেই ঢোকার চেষ্টা করছে!

এভাবে আরো তিন চারবার টোকা দেয়ার পরও আমরা দরজা খুলছি না দেখে ওপাশ থেকে জানানো হলো যে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ওরা ট্রেনেরই লোক। সেই সঙ্গে আরো জানালো যে, ট্রেনে ডাকাতি হয়নি, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। সকাল পর্যন্ত ট্রেন এখানেই থাকবে।

সেই রাত আর কাটতে চায় না। কোথায় ট্রেন থেমেছে কে জানে! কি যে দুর্ঘটনা তাও পরিষ্কার নয় কারো কাছেই।

এক সময় ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলো। আব্বু বাইরে গিয়ে যে খবর আনলেন তা আরো ভয়াবহ। সিগনাল ভুল দেয়ায় আমাদের ট্রেনটি ভুল লাইনে চলে গিয়েছিল। সেই লাইনে দাড়ানো ছিল আরেকটি ট্রেন। কুয়াশার কারণে আমাদের ট্রেনটি আগে থেকে দাড়িয়ে থাকা ট্রেনটি দেখতে পায়নি। ফলে চলন্ত অবস্থাতেই গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে আগের ট্রেনটিকে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের ট্রেনের ইঞ্জিন ছাড়া অন্য বগির বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ওই ট্রেনটির প্রায় ছয় সাতটি বগি পড়ে গিয়েছিল। ট্রেনটি মালবাহী ট্রেন ছিল বলে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

তবে আরেকটি ঘটনা বেশ ভয়ের ছিল। সেটা হলো রাতের বেলা যখন ট্রেনটি থেমে যায় তখন এলাকাবাসীরা কিছুক্ষণ পর লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে এসেছিল লুটপাট করবে বলে। ব্যাপারটা শোনার পর ভয় পাবার চেয়ে আমরা অবাকই হয়েছিলাম বেশি।

সকাল নয়টার দিকে নতুন একটা ইঞ্জিন এলো। রেললাইন পরিষ্কার করা হলো। তারপর আবার আমাদের ট্রেন ঢাকার দিকে রওনা দিল। পরে অবশ্য কোনো ঝামেলা ছাড়াই ঢাকায় পৌছে যাই।

*সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা থেকে*

## বাটপাড়

**- আল- আমিন হোসেন শুভ্র**

বছর সাতেক আগের কথা। দিন তারিখ ঠিক মনে না থাকলেও সালটি ঠিক মনে আছে। ১৯৯৮ সালের শুরুর দিক। সবেমাত্র ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছি। ক্লাস তখনো ভালোভাবে শুরু হয়নি। এই যখন অবস্থা তখনি এলো সেই দিনটি যেদিন আমার প্রথম ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল।

আমার ফুপাতো বোনের বিয়ে ঠিক হলো বগুড়ায়। ছেলে ব্যবসায়ী এবং থাকেন আমাদের গ্রামে। আত্মীয়স্বজন সবাই ঠিক করলেন যে, ছেলের গ্রামের বাড়ি গিয়ে তার বিস্তারিত খোজখবর নিয়ে আসতে হবে। পাত্র হিসেবে নির্বাচিত হলাম আমি। আমার চাচাতো ভাই, আমার দুলাভাই ও ফুপাতো ভাই এবং ফুপাতো বোনের হবু স্বামীসহ মোট পাচজন।

আমি তো খুশিতে আত্মহারা। কারণ বগুড়া যেতে হলে ট্রেনে যেতে হয়। আমি কখনো ট্রেনে চড়িনি। তাই আরো উল্লসিত হলাম।

নির্দিষ্ট দিন রাতে আমার ঘুম হলো না। ভোর পাচটায় উঠে পড়লাম। গোসল করে নাশতা খেয়ে সকলের দোয়া নিয়ে কমলাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ট্রেনের সময় ছিল দশটা বিশ মিনিটে। কমলাপুর পৌছে দেখতে পেলাম টিকেট কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন। কোনো রকমে চারটি টিকেট করে নির্দিষ্ট ট্রেনে উঠে বসলাম।

ট্রেনে উঠে বসতেই দেখতে পেলাম যে, আগেই আমাদের সিট বুকড হয়ে গেছে। সেখানে অন্য মানুষ বসে আছে। তবে তাদের পাশে দুটি সিট খালি আছে। আমাকে ও আমার দুলাভাইকে ওই সিটে বসিয়ে বাকিরা দাড়িয়ে রইলো।

ট্রেনের জানালা দিয়ে বিচিত্র ধরনের মানুষ দেখতে লাগলাম। দেখতে লাগলাম তাদের কাণ্ডকারখানা। তখন ঘড়িতে বাজে বেলা এগারোটা। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গিয়েও ট্রেন ছাড়ছে না। তাই বিরক্তি লাগলো। শেষে সব জল্পনা–কল্পনার অবসান করে ট্রেন যাত্রা করলো বগুড়ার উদ্দেশ্যে।

বাইরের দৃশ্য দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি। এমন সময় চেকার এলো। আমি সিটে বসায় তিনি আমার টিকেট চাইলেন।

কিন্তু আমি ছোট থাকায় দুলাভাই টিকেট করেননি।

চেকার বেকে বসলেন যে, টিকেটের পুরো দাম দিতে হবে।

শুরু হলো তর্কাতর্কি, চেচামেচি, ঝগড়া।

ট্রেন জুড়ে হই চই কাণ্ড। লোকজন যেন মজা দেখছে। শেষে দফারফা হলো, হাফ দাম দেয়া হবে।

তাই দেয়া হলো।

পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলো। যাত্রীরা কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাইরে তাকিয়ে দেখছি সব কিছু যেন দৌড়াচ্ছে। গাছপালা, বাড়িঘর, পশুপাখি সব কিছু যেন পেছনে চলে যাচ্ছে দ্রুত। এই দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো ট্রেনের হুইসলের আওয়াজ শুনে। আমরা বগুড়া পৌছে গেছি। ঘুম থেকে আড়মোড়া ভেঙে উঠলাম। ট্রেনে যাত্রীদের চিৎকার, চেচামেচি ও নামার জন্য তাড়া দেখতে পেলাম। এই ফাকে শুনতে পেলাম যে, ট্রেন থেকে আমাদের একটা ব্যাগ চুরি হয়ে গেছে।

সবাই যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো।

বিমর্ষ হয়ে সবাই নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে।

ট্রেন থেকে নেমেই আবার বাসে চড়তে হলো। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কোনো রকমে একটি সিট নিয়ে দুলাভাই আমাকে কোলে নিয়ে বসলেন। শুরু হলো আরেক যাত্রা। কয়েক মাইল যাবার পর আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম।

একটি বাজারে এসে আমরা উঠলাম।

আমার হবু দুলাভাই জানালেন যে, এই বাজার থেকে তাদের বাড়ি আরো দশ মাইল পূর্বে। এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে অনুন্নত থাকায় সেখানে পায়ে হেটে যেতে হবে। সবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

হবু ছেলের বাড়ি, তাও দশ মাইল পূর্বে! আমরা কেউ যেতে রাজি হলাম না। কিন্তু ছেলের পীড়াপীড়িতে রাজি হতে হলো।

যাবার আগে ছেলে বললো যে, আমরা তো বাড়ি যাচ্ছি। তাই কিছু খাবার কিনে নিই। এই বলে সেই যে গেল আর আসার নামটি পর্যন্ত নেই।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা কেটে গেল, ছেলের আসার নাম নেই। আমাদের ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। একবার একে, একবার ওকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম।

শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকায় ফিরে আসবো। বিষণ্ন মনে স্টেশনে ফিরে এলাম। তখন বাজে বিকাল পাচটা। পরবর্তী ট্রেন রাত সাড়ে আটটায়।

ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম, এ রকম বাটপাড়ের সঙ্গে আমরা এতো দূর কেন এসেছিলাম।

*ভোলাইল, নারায়ণগঞ্জ থেকে*

# ভদ্রবেশী

**- হাসিনা আক্তার খানম**

দেশে *আন্তঃনগর এক্সপ্রেস* ট্রেন চালু হবার দুই কি তিন বছর পরের কথা। ঢাকা যাবো। উপকূল এক্সপ্রেস–এর একটি টিকেট আগেই সংগ্রহ করেছিলাম। ট্রেনটি প্রান্তীয় স্টেশন নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসবে। আমি উঠবো চৌমুহনী স্টেশন থেকে। স্টেশনের কাছেই আমার বাসা। তাই ঘড়ির কাটায় সময় হিসাব করে বাসা থেকে বের হবার মানসিকতা কাজ করছিল। *মক্কার মানুষ হজ পায় না* প্রবাদের মতো অবস্থা হয়েছিল আমার। ট্রেনের হুইসল শুনে বাসা থেকে বের হয়ে স্টেশনে পৌছাতে পৌছাতে ট্রেন আরেকবার হুইসল বাজিয়ে ছেড়ে দিল।

আমার টিকেটের প্রথম শ্রেণীর বগি কোনটা তা দেখার মতো সময় নেই। দ্রুত দৌড়ে কোনো মতে একটা বগিতে উঠে পড়লাম। বগিটি ছিল 'ছ' নাম্বারের সেকেন্ড ক্লাসের। হাতে ছিল একটা বৃফকেস। হাপাতে লাগলাম। একটা খালি সিটে বসে পড়লাম, উদ্দেশ্য একটু বিশ্রম নেবো। একটু বসে নিজেকে সামলে নিয়ে মাঝখানের খাবার গাড়ি পার হয়ে পরে আমার বগিতে পৌছালাম। খুজে বের করলাম আমার সিট। কিন্তু এক ভদ্রলোক বসে আছেন সে সিটে। ভুল করছি না তো? আবার টিকেটের সঙ্গে সিট নাম্বার মিলিয়ে নিলাম। না, ঠিক আছে।

লোকটা ততোক্ষণে আমার দিকে লক্ষ্য করলো এবং দ্রুত দাড়িয়ে বললো, ও সরি, আপনার সিট? আমারটা সামনের সিট। উল্টোমুখী পড়েছে তো, তাই একটু এ সিটে বসলাম।

লোকটা একই ক্যাবিনে সামনের সিটে আমার মুখী হয়ে বসলো। বললো, আপনি বড় ভাগ্যবান, ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে সে মুখী সিট পেলেন। আর আমি যাচ্ছি ঢাকা, বসে আছি নোয়াখালীর দিকে ফিরে।

বললাম, থ্যাংকস আপনাকে। আমি একা যাচ্ছি। দুজনে কথায় কথায় যাবো। ভালোই সময় কাটবে। তবে আমাকে বড় ভাগ্যবান বললেন, আসলে তা নয়। আমি বগি এবং বগিতে সিট নাম্বার, কোন মুখী হবে সেসব দেখেশুনে পরে টিকেট বুক করেছি। আপনিও তা করতে পারতেন।

আরে বলবেন না, আমিও যাচাই করেছি। কিন্তু ঠিক হয়নি। বোকামি হয়েছে কোথায় জানেন, ট্রেন যখন নোয়াখালী যাচ্ছিল তখন বগি এবং সিট দেখে ভেবেছিলাম ফেরার পথে এই সিটটা ঢাকা মুখী থাকবে। বলুন তো ট্রেনের বগি কি আর ঘুরে দিক পাল্টায়?

বোকামির সরল স্বীকারোক্তিমাখা লোকটার কথা শুনে হো হো করে হাসলাম দুজনে। আফসোস হলো তার জন্যে। আড্ডা জমলো দুজনের। ট্রেন ছুটে চললো দ্রুত গতিতে। কখন যে পথে দুই দুটো স্টেশনে ট্রেন থামলো আর লোক উঠলো তা টেরই পাইনি। আন্তঃনগর ট্রেন। তাই সব স্টেশনে থামে না। সোনাপুর থেকে ছাড়ার পর পথে বড় চারটা স্টেশন মাইজদী কোর্ট, চৌমুহনী, সোনাইমুড়ী, লাকসাম ছাড়া অন্য কোনো স্টেশন ধরবে না। ঝক ঝকাঝক শব্দ, মাঝে মধ্যে ভো ভো হুইসল এবং দ্রুত গতিতে ছুটে চলা।

বৃটেন, আমেরিকা অথবা চায়না, জাপানের মতো উন্নত দেশগুলোতে যাইনি। তবে টেলিভিশনের পর্দায় সেসব দেশের উন্নত, আধুনিক ও দ্রুত গতির ট্রেন আর তার চলা দেখেছি। মনে মনে কল্পনা করতে লাগলাম আমি যেন সেই সব ট্রেনে চড়ে যাচ্ছি দ্রুত গতিতে, একেবারে ঘণ্টায় তিনশ কিলোমিটার বেগে। চোখ বন্ধ করে কল্পনা। যাচ্ছি সাহারার ধুধু মরুর বুক ছিড়ে রাশিয়ান কোনো ট্রেনে। মুহূর্তে কল্পনা পাল্টে গেল। না, আমি যাচ্ছি চায়নার রাজধানী বেইজিং থেকে আন্তঃদেশীয় ট্রেনে, যাবো জাপানের রাজধানী টোকিও-তে। ট্রেন চলছে শীতের ঋতুতে তুষারে ঢাকা শাদা ধবধবে পাহাড়ের কোল ঘেষে গ্রাম আর জনপদ পাড়ি দিয়ে।

না, কল্পনার এই সুখটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। হঠাৎ ঝমঝম শব্দে চোখ খুললাম। দেখলাম, রেললাইনের পাশ ঘেষে বিরাট বিরাট উচু দালান। রেললাইনে ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে সৃষ্ট শব্দ এবং ইঞ্জিনের শব্দ প্রসাদ প্রাচীরে বাধা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে এ রকম শব্দ হলো। সেই শব্দ আমার কল্পনার সুখকেও কেড়ে নিল।

এরই মধ্যে বোটকা গন্ধে নাকে রুমাল চাপলাম। কিসের গন্ধ পরখ করতে চোখের দৃষ্টি গেল বাইরের দিকে। রেললাইনের পাশ ঘেষে সরকারের খাস জমিতে গড়ে ওঠা দীর্ঘ বস্তির নোংরা পরিবেশ। শুধু তাই নয়, বস্তির মানুষদের তৈরি চটের বস্তায় ঢাকা ঝুলন্ত পায়খানা, এরই দুর্গন্ধ।

ভাবলাম লোকাল ট্রেনে তো চড়িনি। তবে সেই লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো বিশ্রী শব্দ কেন? মনে কৌতূহল জাগতেই ট্রেনটি লাইনের বাকে মোড় নিল। ইঞ্জিনটি নজরে এলো। দেখতে পেলাম এতো উপকূল এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন নয়। বুঝলাম লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিন ধার নিয়ে নিশ্চয়ই এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হচ্ছে।

আমার ট্রেন ভ্রমণের সেই সময়টা ছিল শীতের। সূর্যাস্তের পর পূর্বাকাশে দেখা দিল রূপালী চাদ। চাদোয়া রাতে মনটা আবার আনন্দে নেচে উঠলো। আমি যাচ্ছি প্রয়োজনে। সেই সঙ্গে ভ্রমণটা হয়ে উঠলো উপভোগ্য। যখন জ্যোৎস্নাস্নাত বাংলার বুক মুগ্ধ মনে দেখছিলাম ঠিক সে সময়ে এলো ট্রেনের টিকেট চেকার। টিকেট দেখালাম। দেখে তারা টিকেট ফেরত দিল। সামনের সিটের লোকটাকে দেখলাম হঠাৎ করেই ঘুমের ভান ধরলো। ভান নয়, যেন সে সত্যি সত্যিই ঘুমে ঢলে পড়ছে।

ওরা বললো, এই যে জনাব, আপনার টিকেট।

এমনভাবে বললো যেন লোকটার ঘুম ভাঙতে বাধ্য।

লোকটা একটু চমকে কাচা ঘুম ভাঙার ভাব দেখিয়ে বললো, যাও তো এখন, যত্তো সব! ঘুমের ডিস্টার্ব করো না। পরে এসো। বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো যেন লোকটা।

টিকেট চেকার একজন বিনয়ের স্বরে অথচ জোরে বললো, স্যার, টিকেটটা আমরা দেখে যাই, তারপর আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান।

উপায়ান্তর না দেখে লোকটা উঠে দাড়ালো। একে একে শার্ট-প্যান্টের সব পকেট হাতড়ালো, এরপর বৃফকেস এবং সিটের উপর-নিচ যেন টিকেটটা কোথায় রেখেছে মনে করতে পারছে না অথবা কোথায় পড়ে গেছে খুজে পাচ্ছে না। একটু ঘেমে গেল লোকটা।

টিকেট চেকাররা বললো, টিকেট খোজ করে রাখুন, আমরা আসছি।

একটু পরেই লোক দুজন আবার এলো। বললো, কই, টিকেট পেয়েছেন?

বললাম, তিনি বোধ হয় ভুলে টিকেট বাসায় ফেলে এসেছেন।

ভদ্রবেশী লোকটা আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললো, ঠিক ধরেছেন, আসলে তাই হবে। এখন কি করি?

এখন কিছুই করতে হবে না আপনাকে। শুধু যেতে হবে রেলওয়ে হাজতে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন রেল পুলিশ তার হাতে হাত কড়া পরালো।

বললাম, কি করছেন? ভদ্রলোক ভুলে টিকেট ফেলে এসেছেন।

জি না। তিনি টিকেট করলে তো ফেলে আসবেন। আমরা চেক করে দেখেছি এ সিটের টিকেট বিক্রিই হয়নি। মাঝে মধ্যে ভদ্রবেশী চিটার এ দেশে বিচিত্র কিছু নয়।

আশ্চর্য হলাম। ভদ্রলোক এমন কাজ করতে পারেন? এতোক্ষণ তাকে ভদ্রলোক মনে করেই কথা বলছিলাম। এখন প্রচণ্ড ঘৃণা জমলো তার প্রতি। এর আগে লক্ষ্য করছিলাম, তার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, লোকটা প্রায়ই সামনে পেছনে বার বার তাকাতো। টেনশন মাখা দৃষ্টি। কখন ধরা পড়ে এই ভয়ের ছাপ। কিন্তু তখন বুঝিনি, এখন বুঝলাম এসবই ছিল তার টিকেট না কেটে ট্রেনে চড়ে একেবারে ফার্স্ট ক্লাসে বসে আরামে যাওয়ার আড়ালেও ধরা পড়ার টেনশন।

ট্রেনে বিনা টিকেটে চলার প্রবণতা, কালচার অনেক দিনের এবং অনেকের। তবে সেসব লোকাল ট্রেনেই বেশি দেখা যেতো। আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেনে এই প্রথম দেখলাম।

মনে পড়লো একবার লোকাল ট্রেনে চড়েছিলাম। প্রচণ্ড ভিড়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতেও দাড়িয়ে দাড়িয়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে অনেকে যাচ্ছে। আমি সিট পেলাম। আমার পাশেই একজন দাড়িয়ে উপরের রডটা এক হাতে ধরে সে হাতের ওপর মাথাটা হেলিয়ে নিশ্চিন্তে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঘুমাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর হাত বদল করছে আবার একই কায়দায় ঘুমাচ্ছে। টিকেট চেকার যখন এলো, টিকেট দেখিয়ে আবার নিশ্চিন্তে ঝিমিয়ে ঘুমাচ্ছিল। টেনশন ছিল না তার। আর পরের এ লোকটা টিকেট ছাড়া ফার্স্ট ক্লাস বগিতে আরামে বসে থাকলেও শান্তি ছিল না তার মনে। ছিল টেনশন। শেষ পর্যন্ত ধরাও পড়লো। হয় তো শাস্তিও পাবে।

ট্রেন কমলাপুরে পৌছালো সন্ধ্যা রাতেই। তবে আধা ঘণ্টা লেইটে। উঠলাম বোনের বাসায়। ভগ্নিপতি আল্লাহ ভীরু লোক। ছিমছাম সংসার। ডিনারে বসে পথের ঘটনা বর্ণনা করলাম। বললাম, আল্লাহ বলেছে, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, দেখো মিথ্যাবাদীদের পরিণতি। একেবারে হাতেকলমে দেখলাম।

দুলাভাই শুনলেন, হাসলেন আর ঘৃণা প্রকাশ করলেন। লোকটার পরিণতির জন্য দুঃখও করলেন। এক সময় গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, আমিও এ রকম একটা অপরাধে অপরাধী। ছাত্র জীবনে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একবার টিকেট ছাড়া নোয়াখালী থেকে কুমিল্লায় গিয়েছিলাম। ধরা পড়িনি। দুনিয়ায় বাচলেও পরকালে যে ধরা পড়বো তা তো নিশ্চিত। কিভাবে বাচবো, এর প্রায়শ্চিত্ত কি?

বললাম, বিষয়টা তো জটিল। কোনো ব্যক্তি পাওনা থাকলে তাকে পরিশোধ করে বাচা যেতো। কিন্তু এতো দেশের, দেশের জনগণের পাওনা। এ পাওনা পরিশোধের কোনো উপায় বা পথ তো দেখছি না।

আপা বললেন, বাচতে চাইলে এটা তো খুবই সহজ পথ।

আমি, দুলাভাই দুজনেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে?

তিনি বললেন, কখনো নোয়াখালী স্টেশন থেকে কুমিল্লার একটি টিকেট কিনে ছিড়ে ফেললেই হলো। রেলওয়ে বা সরকার তার পাওনা পেয়ে গেল।

সত্যিই, যে বাচতে চায়, আল্লাহ তার বাচার পথ খুলে দেন।

*চট্টগ্রাম থেকে*

# থ্রিল

**- রাশেদুল হাসান রাশেদ**

ঘুমের মধ্যেই ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর অক্সফোর্ড জুতা পরে দৌড়াদৌড়ির শব্দ, চিৎকার, বিদায় সম্ভাষণ, বিভিন্ন কথাবার্তা বিচ্ছিন্নভাবে কানে আসতে লাগলো। ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা খুব ভালো হয়ে গেল।

আজ ছুটি। আরসিসি অর্থাৎ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ (পড়ুন রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার) থেকে এক মাসের জন্য ক্যাডেটদের (পড়ুন কয়েদিদের) ছুটি দেয়া হয়েছে।

কিন্তু ভালো লাগাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ ক্যাম্পাস থেকে যে বাস ভোরে আমাদের রাজশাহী শহরে পৌছে দেয় সেটা ছাড়তে আর পাচ মিনিট সময় হাতে আছে। কোনো মতেই সম্ভব না বাসটা ধরা এবং রাজশাহী থেকে *আন্তঃনগর কপোতাক্ষ* ধরাটাও অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু যশোর পৌছাতে হলে কপোতাক্ষ ধরতেই হবে।

ধুর! কোনো ব্যাপার না। অনিশ্চিত যাত্রাতে কেন জানি না অসম্ভব থৃল অনুভব করি। খাকি পরে, লাগেজ টানতে টানতে যখন মেইন গেট দিয়ে বের হলাম তখন বাস চলে গেছে এবং আমার থৃল বাড়াতে কোনো রিকশাও নেই বাইরে।

আমাদের ক্যাম্পাস রাজশাহী থেকে অনেক দূরে সারদায়, এককালের প্রমত্তা পদ্মার কোল ঘেষে অবস্থিত। আমাকে এখন রিকশা, ভ্যান যেকোনোটাতে চড়ে বানেশ্বরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে বাসে করে রাজশাহীতে।

কোনো উপায় না দেখে কয়েক বন্ধু মিলে একটা টমটমে উঠলাম। দুলকি চালে ঘোড়া টেনে নিয়ে চললো আমাদের। বানেশ্বরে পৌছে কোনো বাস পেলাম না। ইতিমধ্যে কপোতাক্ষের মতোই সময় বয়ে চলেছে। অবশেষে একটা ট্রাক থামিয়ে পেছনে উঠলাম।

রাজশাহী টার্মিনালে গিয়ে পৌছালাম। লাগেজ নিয়ে স্টেশনে ঢুকে দেখি ট্রেন হুইসল বাজিয়ে এইমাত্র চলতে শুরু করেছে। টিকেট কাউন্টারের দিকে তাকালাম। চল্লিশ পঞ্চাশজনের বিশাল লাইন। কোনো দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে একেবারে শেষ বগিটাতে উঠলাম। যাক! ট্রেনটা ধরতে পারলাম শেষ পর্যন্ত।

যে বগিটাতে উঠেছি সেটাতেই কয়েকজন সিনিয়র ভাই উঠেছেন। তাদের দেখে একটু ভরাসা পেলাম। কিন্তু আমি যে টিকেট কাটিনি তা আর বললাম না।

ছুটির ভেতর সিনিয়র–জুনিয়র সম্পর্কের তেমন কড়াকড়ি থাকে না, বরং সবাই ফৃলি মেশে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। এর মধ্যেই বড় ভাইদের সঙ্গে গল্পগুজব করছি, খাওয়া–ধাওয়া করছি, মজা করছি।

কলেজের আর্মির ডাক্তার কিভাবে কথা বলে একজন নকল করে দেখালো।

হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই।

এর মধ্যে পাশের একজন লোক খাকি ড্রেস পরা একদল কিশোর–তরুণ দেখে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই, আপনারা কোথায় চাকরি করেন?

এক ভাইয়ের গম্ভীর উত্তর, আমরা আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের বিশেষ টিম, খুলনা যাচ্ছি।

বলেই দ্বিতীয় দফা হাসি সবাই মিলে।

বগির যাত্রীরা সবাই আমাদের দিকে একটু সমীহ নিয়ে তাকাচ্ছে।

হাসি চেপে রাখতে পেট ফেটে যাচ্ছে।

হার্ডিঞ্জ বৃজ পার হলাম। ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কোটচাঁদপুর পার হলাম। আর দুটো লোকাল স্টেশনের পরই যশোর।

বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে দুজন ভাই সামনের বগিগুলো ঘুরতে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মুখ কালো করে ফিরে এসে বললেন, টিটি আসছে টিকেট চেক করতে।

সব বড় ভাই একটু মিইয়ে গেলেন এ কথা শুনে।

বুঝলাম না কিছু। টেনশন করার কথা আমার, তারা কেন টেনশন করছেন। পরে জানলাম সবাই একই ঝাড়ের বাশ অর্থাৎ কেউ টিকেট করেননি, করতে পারেননি।

আহ কি আনন্দ! আমি একা নই তাহলে।

এদিকে আমরা যে বগিতে রয়েছি, টিটি সেই বগিতে ঢুকে টিকেট চেক করা শুরু করেছেন। যেহেতু এটাই শেষ বগি সেহেতু আমাদের যাওয়ার জায়গাও নেই। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। শুনেছি ফাইন করে নাকি! অপমানও নাকি করে!

যাই হোক সবাই একেবারে পেছনের দরজার কাছে এসে দাড়ালাম। টিটি এগিয়ে আসছে। ট্রেনও এইমাত্র যশোর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পার হলো। এরপরই যশোর স্টেশন। অল্প একটু দূর।

কিন্তু ট্রেনের গতি বড়ই মন্থর যেন রাজকীয় হংসবলাকা। হেলে-দুলে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই তো দূরে *যশোহর* লেখা স্টেশনের সাইনবোর্ড চোখে পড়লো মনে হলো।

ট্রেন ততোক্ষণে শম্বুকগতি অর্জন করেছে এবং ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, টিটি আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছে। কিন্তু কি এক দুর্বোধ্য কারণে আমাদের কাছে টিকেট চাইলো না।

স্টেশনে এই মাত্র ট্রেন প্রবেশ করেছে। গতি মন্থর হলেও লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামা যাচ্ছে না।

স্টেশনে নামা যাবে না, আগে নামতে হবে। কানে কানে বললেন নাসির ভাই। কারণ ওখানে ভ্রাম্যমান টিকেট চেকার হালি হালি।

একটু স্লো হলে ব্যাগ নিয়ে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলাম আমি একা। নেমেই শর্টকাট মারছি। হঠাৎ পেছন থেকে এই এই ডাক। গতি বাড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু অন্য বগির অন্য এক টিটি দৌড়িয়ে আমার সামনে এসে দাড়ানো। কেন লাফ দিলাম, টিকেট কোথায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা শুরু করলেন।

সত্যি কথা বললাম, টিকেট কাটতে পারিনি।

উনি ঘুস চাইলেন।

সামনে তাকালাম। দেখি বড় ভায়েরা নির্বিঘ্নে স্টেশন পার হয়ে যে যার গন্তব্যস্থানে যাওয়ার জন্য রিকশায় উঠে বসেছেন।

তাহলে আমিই ফাসলাম শেষ পর্যন্ত! *অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়* – এই প্রবাদ বাক্যটা নিয়ে চিন্তা করছি। এমন সময় *একজনের চেয়ে দশজনের কাছ থেকে ঘুস খাওয়া সুবিধাজনক* এই ভেবে টিটি অন্য এক গ্রুপ বিনা টিকেটের যাত্রীর দিকে তাকাতেই পিঠটান দিলাম। এ গলি, সে গলি পার হয়ে রিকশায় উঠলাম। এবং বেচে যাওয়া টিকেটের টাকা দিয়ে এক কেজি স্পঞ্জ রসগোল্লা কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন থ্রিলের চরমে অবস্থান করছি।

*জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে*

# আমি ট্রেন স্টেশন ও ভালোবাসার অন্তর্বাস

**- এস. হোসাইন**

আমার প্রিয় স্ত্রীর চাপে বাধ্য হয়ে ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাসে ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদন করি। কিছুদিন পর আমাকে জানানো হলো, আমার আবেদন গৃহীত হয়েছে। আমার বিদেশ যাওয়ার আগ্রহ কম থাকায় আমার স্ত্রী সব সময় আমাকে তাগাদা দিতেন ভিসার কতোদূর কি হলো তার খোজখবর নেয়ার জন্য। রাজনৈতিক, সরকারি-বেসরকারি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দুর্নীতি, মানুষের কর্মবিমুখতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, সময়ের গুরুত্বহীনতা, সর্বক্ষেত্রে মানুষের ধীরগতি, অন্যায় আচরণ, আবেগ, ধর্ম, পোশাক, সামাজিক রীতি-নীতি, ক্ষতিকর ও অসম উত্তরাধিকারী আইন, সর্বোপরি মেয়েদের প্রতি অশ্রদ্ধা, অসম এবং অসভ্য আচরণ, দেশ ও সমাজের অগ্রগতির বাধা বলে মনে করে আসছি বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে।

১৯৮৮ থেকে ১৯৮৯ সালে কোনো একদিন এক মন্ত্রী বাহাদুরের নির্দেশে তার সন্ত্রাসীদের চাকরি না দেয়ার কারণে আমার প্রাণনাশের হুমকিতে বিচলিত হই।

স্ত্রীর দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করি।

১৯৯১ সালের প্রথম দিকে একদিন বিকেলে অফিস থেকে বাসায় ফিরতেই আমার পাচ বছরের বড় ছেলে আমাকে বললো, বাবা, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অস্টেলিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমাকে ফোন করেছিল।

স্ত্রী ব্যাখ্যা করায় পরদিন পাসপোর্টসহ অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাসে যাই।

ইমিগ্রেশন অফিসার *দেরি হবার জন্য* ক্ষমা চেয়ে আমাদের পাসপোর্টগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ভিসার লাগিয়ে দেন।

দূতাবাস থেকে বাসায় ফিরতেই আমার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে কেদে ফেলেন দুই সন্তানের সুশিক্ষার সুযোগ আসায়।

সাজানো সংসার, কর্মজীবন, অনেক সম্পত্তি ও প্রিয় মাতৃভূমিকে ছেড়ে যাওয়ার কান্না নিয়ে আমরা অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্য প্লেন ধরি।

আমি আজ আমার নিজ মাতৃভূমিতেই প্রবাসী।

মেলবোর্ন শহরে গাড়ি পার্কিংয়ের অসুবিধার কারণে প্রতিদিন আমাকে গ্লেনরয় ট্রেন স্টেশন হয়ে ফ্লিনডার্স স্টেশন যেতে হয় ট্রেনে করে আমার কর্মক্ষেত্রে। ট্রেনটি মূল শহরে ঢোকার আগেই মাটির নিচে চলে যায় এবং শহরের লুপ (Loop) ঘুরে বিভিন্ন স্টেশন ছুয়ে মাটির উপরের বিশাল ফ্লিনডার্স স্টেশনে তার যাত্রা শেষ করে। কয়েক বছর আগে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেখেছিলাম, এক বছরে প্রায় চার শতাংশ ট্রেন নির্ধারিত সময় চলাচল করতে না পারায় জনগণের কাছে ট্রেন কম্পানি ক্ষমা চেয়েছে। একইভাবে এক বছরে অস্ট্রেলিয়ার পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কোটি কোটি চিঠিপত্রের মাঝে সম্ভবত তেরোটি হারিয়ে ফেলার জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্রিকাতে বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

স্টেশনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রায় একশ মিটার প্রশস্থ ইয়ারা (Yarra) নদীর উপর দিয়ে পায়ে হাটা বৃজ পার হয়ে আমার কর্মস্থলে যাই। আমার কর্মস্থলে পয়ত্রিশজন সহকর্মীর মধ্যে আমরা তিনজন মাত্র পুরুষ।

জুন ও জুলাইতে মেলবোর্নে প্রচণ্ড শীত।

একদিন বিকাল পাচটায় কর্মস্থল থেকে যখন বের হলাম তখন বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এবং হাড় কাপানো শীতল বাতাস বইছে। আমি হাটছি সুন্দর করে বাধানো ইয়ারা নদীর পাড় দিয়ে। হঠাৎ নিচে লক্ষ্য করলাম নানান রঙের ব্রা (Bra) একটার সঙ্গে আরেকটা বাধা। অবাক হলাম আর হাটতে লাগলাম ব্রা-র লাইন ধরে নদীর পাড় দিয়ে। প্রায় দুইশ গজ হাটার পর বৃজের গোড়ায় দেখলাম তিনটা মেয়ে বসে আছে একটা সাহায্যের বক্স নিয়ে। বক্সের ওপর লেখা, *ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য সাহায্য করুন*।

আমার ভালো লাগলো অদ্ভুত ধরনের সাহায্য চাওয়ার পদ্ধতি দেখে। পকেট থেকে দশ ডলার দিয়ে বৃজে উঠে গেলাম।

সারা দিন একটিবারের জন্যও সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। অন্যান্য দিনের মতো ইয়ারা নদীর উপরের বৃজটা পার হয়ে ফ্লিনডার্স স্টেশনে দাড়াই ট্রেনের অপেক্ষায়। ছড়ানো-ছিটানো নানান বয়সের যুগল যাত্রীরা প্রচণ্ড শীতে জড়াজড়ি করে দাড়িয়ে এবং বসে আছে। আমিও শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাড়িয়ে আছি। আমার পাশেই জড়িয়ে থাকা আঠারো বিশ বছর বয়সের এক যুগল তরুণ-তরুণী ফ্লোরে বসে আছে একইভাবে ট্রেনের অপেক্ষায়।

মনে হলো বাতাসটা ততোক্ষণে আরো জোরে বইতে শুরু করেছে। তাপমাত্রা সম্ভবত সাত আট সেলসিয়াস। আমার গায়ের পার্কারের মাথার হুডটা উঠিয়ে কান ঢেলে নিলাম। আড়চোখে তাকলাম আমার পাশে জড়িয়ে

থাকা যুগলের দিকে। দেখলাম পাশে রাখা মেয়েটার ব্যাগে ছেলেটা কি যেন খুজছে। প্রেমিকার ব্যাগ থেকে বের করলো মিষ্টি গোলাপি রঙয়ের সুন্দর একটা প্যান্টি। তারপর নিঃসঙ্কোচে সেটা টুপির মতো মাথায় দিয়ে তার কান দুটোকে ঢেকে নিল।

আশপাশের সকলে আমার মতো লুকিয়ে মুচকি হাসলো ভালোবাসার এই সুন্দর রূপ দেখে।

ততোক্ষণে আমার ট্রেন এসে গেছে।

*পূর্ণ ঠিকানা বিহীন*
*মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া থেকে*

# বিয়ের শাড়ি

**- শরীফা বেগম**

বিশ বছর আগের লোকাল ট্রেন আর আজকের এই লোকাল ট্রেন অনেক ভিন্ন। কি পরিবেশে, কি মানুষজনে। শান্ত, নিরিবিলি, সুন্দর পরিবেশ, স্বল্প সংখ্যক যাত্রী। এসব নিয়েই ছিল তখনকার ট্রেনের যাত্রাপথ।

ময়মনসিংহ থেকে গফরগাও! কতোটুকু সময়ই বা লাগবে। তাই সাহস করে একাই যাচ্ছিলাম। উপলক্ষ্য ননদের বিয়ে। বিয়ের বেশ কয়েকটা দিন আগেই রওনা দিয়েছি। মন মাতানো আকুল করা আকাশ, বাতাস, মাটি সব কিছুই যেন শহর থেকে আলাদা একটা আমেজ খুজে পাই গ্রামের ভেতর। পায়ে চলা ভিজে স্যাতস্যাতে মাটির সোদা গন্ধ, পাখির কলকাকলি। সোনালি ধানের দুলুনি দারুণভাবে আকৃষ্ট করে আমায়। বিশেষ করে গ্রামের বোকা-সোকা, সরল মহিলাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারি সহজেই।

বেশ ফাকা বগি। তিন বছরের ছেলে রিয়াদকে নিয়ে বসেছি। আশপাশের কিছু যাত্রী যে যার মতো সময় কাটাচ্ছে। দুষ্টু ছেলেটাকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারছি না। চুপটি করে কোলে বসে থাকবে এমন ছেলেই সে নয়। এতো দুরন্ত। আমার পায়ের নিচে রেখেছি গোবদা মার্কা ব্যাগটাকে। তো, ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে একবার ব্যাগটার ওপর হুমড়ি খেয়ে রিয়াদ পড়ে গেল।

এবার ব্যাগটাকে অনেক কষ্টে উপরে ওঠাই। উপরের বার্থে দুটো লোক বসে ঢুলছে। গ্রামীণ চেহারা। তাদের পাশেই ব্যাগটার জায়গা হলো।

এককালে গফরগাও *ডাকাতিয়া অঞ্চল* হিসেবে বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। বর্তমানে অবশ্য সে রকম পরিস্থিতি আর নেই।

যাহোক, ট্রেন তার নিজস্ব গতিতে ধলা স্টেশন ছেড়ে গেল। এবার নেমে যাবার প্রস্তুতি নিতে হয়। পরের স্টেশন গফরগাও। ওখানে আমাদের লোক থাকবে। বাড়িতে নিয়ে যাবে। আগে ব্যাগটাকে সামলাতে হবে।

কিন্তু একি! ওপরে তোলা আমার দুটো হাত যেন চুপসে গেল। বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠলো। ব্যাগটা শোলার মতো হালকা। ভেতরে দুই চারটা শাড়ি ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

ইতিমধ্যে লোক দুটোও যে হাওয়া। না, টাকা-পয়সা অথবা গয়না-গাটি অবশ্য ছিল না। কিন্তু যা ছিল তা তো গয়নার তুল্য নয়। এ যে অনেক স্বপ্ন! অনেক আবেশ মাখানো একটি রাতের স্মারক চিহ্ন। বিয়েতে পরার জন্য বিয়ের শাড়িটা ছিল। এছাড়াও ছিল আরো বেশ কিছু দামি শাড়ি, রিয়াদের কাপড়-চোপড়। অথচ বাসায় পরার কাপড়গুলো ছুয়েই দেখেনি। কখন করলো এতো যাচাই-বাছাই এতোগুলো লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে! মনটা বিষাদে ভরে উঠলো। বিয়ের পর পরই গয়নাগুলো চুরি হয়ে গেছে। এবার শাড়িটাও গেল।

বিয়ের স্মৃতি বলতে আর কিছুই রইলো না।

*গোহাইলকান্দি, ময়মনসিংহ থেকে*

# প্রথম যাত্রা শেষ যাত্রা

- শারমিন আক্তার

থার্ড সেমিস্টার। অনার্স করছি MIU–তে। কিন্তু আমার যে অভিজ্ঞতার কথা লিখছি, তখন আমি বেশ ছোট। সিক্সের প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর বাবা, মা ও ছোট ভাই তন্ময়ের সঙ্গে ইনডিয়া বেড়াতে যাচ্ছি। আমাদের গ্রামের বাড়ি মেহেরপুর। তাই তখন ট্রেন লাইনটাও আমার জন্য বড় আকাঙ্ক্ষার জিনিস।

এরই মাঝে এক মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমি ও আমার চাচার মেয়ে লাভলি। দুজনে মিলে আব্বার সঙ্গে বড় আপার বাড়ি ঢাকাতে বেড়াতে আসছি। তখন আমরা দুজনেই ফাইভে পড়ি। দুজনে জানালার দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ লাভলি বলে উঠলো, সোহেলি, রেললাইন দেখেছিস।

বললাম, কোথায় দেখলি?

লাভলি বললো, এইমাত্র রাস্তার মাঝখান দিয়ে একটা রেলপথ চলে গেল।

কেন আমাকে দেখালি না, এবার দেখলে আমাকে আগে থেকে বলবি।

এরপর শুরু হলো রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা। পাঠক, বুঝতেই পারছেন, যে মানুষটা রেললাইন দেখার জন্য এতো ব্যাকুল হয়েছিল সে মানুষটা প্রথম যখন ট্রেনে চড়েছে তার মনের অবস্থা কেমন ছিল।

এবার আসল ঘটনায় আসা যাক। মেহেরপুর থেকে বাসে চুয়াডাঙ্গা হয়ে দর্শনা পৌছালাম। চেকপোস্টে আব্বা যাবতীয় কাজ সারছেন। এর মাঝে আমরা হাল্কা নাশতা সেরে নিলাম। কেননা অনেক সকালে বাড়ি থেকে বের হতে হয়েছিল আমাদের। তাই আমরা না খেয়েই বের হয়েছিলাম।

চেকপোস্টে যাবতীয় কাজ সেরে রেললাইনের ওপর দিয়ে হেটে হেটে বর্ডার ক্রস করলাম।

গেদিতে পৌছানোর আগে রাস্তার মাঝে আমাদের আরও একবার চেক করা হলো। গেদিতে আমাদের আবারও পূর্ণ বিবরণ নেয়া হলো। কার কাছে কি আছে, কতোটুকু আছে ইত্যাদি। আব্বা–মা এগুলোর হিসাবে দিচ্ছেন আর আমরা দুই ভাইবোন বাইরে বারান্দায় বসে আছি এবং ভাবছি যখন আমরা রেললাইনের ওপর দিয়ে হাটছিলাম তখন যদি একটা ট্রেন চলে আসতো, তখন যদি আমার পা রেললাইনে আটকে যেতো!

সব ঝামেলা শেষে আমরা চা এবং কেক কিনে নিয়ে বসেছি। এমন সময় ট্রেন এসে হাজির।

এই প্রথমবারের মতো ট্রেনে উঠে বসলাম। গেদি থেকে আমরা পৌছালাম রানাঘাটে। এবারে ট্রেন চেঞ্জ করতে হবে।

ট্রেন থেকে নেমে আমরা এক হোটেলে লাঞ্চ করতে গেছি। এসে দেখি আমরা যে ট্রেনটাতে যাবো সেটা পাচ মিনিট আগে ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন চার ঘণ্টা পর।

অপেক্ষার সময় যে কি বিরক্তিকর, সেদিনই প্রথম বুঝতে পারি। বসে বসে চারপাশের মানুষ দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমাদের। কেউ কেউ এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে। তবে তারা আমাদের দেখেই কেন জানি বুঝতে পারছিল যে, আমরা বাংলাদেশি।

তাদের বেশির ভাগ লোকের প্রথম প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

চার ঘণ্টা পর আমাদের কাঙ্ক্ষিত ট্রেন এলো ঠিকই তবে তাতে কোনো সিটই নেই। আব্বা–মা দাড়িয়ে থাকলেন এবং আমাদের দুই ভাইবোনকে সিটের মাথার ওপর শোবার জায়গায় উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন।

আমরা দুজন বসে বসে লোকজন দেখছিলাম। তারা কি করছে দেখছিলাম আর বার বার দেখছিলাম আব্বা–মাকে।

মা অর্ধেক পথেই সিট পেয়েছিলেন। আব্বাকে সারাপথই দাড়িয়ে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। ইনডিয়ায় ট্রেন ভ্রমণে যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছিলাম সেটা হচ্ছে, ভিড়ের মেইন কারণ হকার। দাড়ানো জায়গা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে হকারের জন্য পুরো ট্রেন অস্থির। চারদিকে চিল্লাচিল্লি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের নামে।
অবশেষে আমরা পৌছালাম পলাশি। সেখান থেকে ভ্যান নিয়ে পৌছালাম বড়চাদঘর আব্বার মামাতো ভাইয়ের বাড়ি।
ইনডিয়ায় যাওয়াটা ছিল আমার প্রথম এবং বাংলাদেশে ফিরে আসাটা এখনো পর্যন্ত আমার শেষ ট্রেনযাত্রা। বাংলাদেশের ট্রেনগুলোতেও কি এমনই অবস্থা? আমার জানা নেই।

*কমলাপুর, ঢাকা থেকে*

# লাল পেয়ারি কা চায়ে

**- মুহাম্মদ জাহির**

নানাবাড়ি মেহেরপুর, দাদাবাড়ি রংপুর ট্রেন ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। তাই ছোটবেলাতেই ট্রেনের প্রেমে পড়ে যাই। পার্বতীপুর থেকে ট্রেনে চড়ে চুয়াডাঙ্গা নামতাম। আনন্দে মন ভরে উঠতো। আর কতো দূর নানা বাড়ি?
ইনডিয়ার কলকাতায় লেখাপড়ার কারণে আমার ট্রেনের রুট ছিল সৈয়দপুর টু যশোর। সৈয়দপুর থেকে সন্ধ্যা সাতটায় *আন্তঃনগর একতা এক্সপ্রেস*-এ চড়ে পরের দিন ভোরে যশোরে নেমে যেতাম। একতা ট্রেনটি মোটামুটি ভালো। টয়লেট, পানি, বাতি, পাখা, হোটেল, নামাজের বগিসহ সব কিছু আছে।
একদিন সৈয়দপুর গিয়ে জানতে পারলাম আজ একতা বন্ধ। কিন্তু আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। বাধ্য হয়ে *মেল* নামের একটি ট্রেনে চেপে বসলাম। বগিতে বাতি কম। তবে দেখা যায়। টয়লেট আছে, পানি নেই। দুই লিটারের দুটি বোতল কিনলাম।
নির্দিষ্ট সময়ের তিন ঘণ্টা পর ট্রেনটি নড়তে শুরু করলো। প্রতি স্টেশনে ট্রেনটি থামছে আর চোরাকারবারীরা বিভিন্ন ধরনের মালামাল ট্রেনে তুলছে। ভিসিডি প্লেয়ার, চিনি, লবণ ইত্যাদি।
এক সময় দেখি পা রাখার জায়গা নেই। মালামালে ভর্তি পুরো ট্রেন। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছি যেন টয়লেটের দরকার না হয়। মাঝে মধ্যে পুলিশ এসে হাতের লাঠি দিয়ে বস্তাতে গুতা মারছে আর টাকা নিচ্ছে। যে যা পারে দুই টাকা, পাচ টাকা, দশ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছে। চেকার এসে ঠিক পুলিশের মতো ঘটনা ঘটালো। এভাবে এক সময় যশোরে নেমে সোজা বেনাপোল।
বর্ডার পার হয়ে বনগাও থেকে ট্রেনে চড়লাম। বিরাটি যাওয়ার জন্য শিয়ালদহ পর্যন্ত আমাকে যেতে হলো না যেহেতু দমদম এয়ারপোর্টের সামনে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল।
কলকাতার এই ট্রেনগুলো ইলেকট্রক দ্বারা চালিত লোকাল ট্রেন। টয়লেট নেই, পানি নেই। পর্যাপ্ত বাতি ও পাখা নেই। তবে চলে দ্রুত ও সময়ের কাণ্ডজ্ঞান আছে। এই ট্রেনগুলোতে এতো ভিড় হয়, যেকোনো হার্টের রোগী মারা যাবে। এছাড়া আপনি পাবেন পকেটমার ও ধোকাবাজ। এই ট্রেনের যাত্রীরা বাংলাদেশি কোনো যাত্রীকে পেলে বিভিন্নভাবে হয়রান করে।
ট্রেন চলতে শুরু করলো, একটি স্টেশন থেকে যাত্রী নামছে তার দ্বিগুণ উঠছে আর আমার প্রস্রাবের বেগ বেড়েই চলছে। সিদ্ধান্ত নিলাম বিরাটি পর্যন্ত যাবো। তাই মনটা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছি। আমার দুপাশে মেয়ে। সামনে মেয়ে। কিন্তু লাভ হলো না। অবশেষে যুদ্ধ করে বারাসাত স্টেশনে নেমে টয়লেটের কাছে গিয়ে প্যান্টের জিপার খোলার আগেই কাজ শেষ। প্যান্ট বদলিয়ে আবার ট্রেন ধরে বিরাটি গেলাম। পরের দিন দিল্লি যেতে হবে।

স্পেন দূতাবাসে আমার ইন্টারভিউ আছে। মৌমিতা বার বার নিষেধ করেছে যেন দিল্লি না যাই। কারণ গুজরাটের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ইনডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মৌ-কে বুকে জড়িয়ে ধরে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিস করে হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। দূরপাল্লার ট্রেনগুলো হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। দমদম থেকে মেট্রোরেল অর্থাৎ পাতালট্রেন-এ করে ধর্মতলা, তারপর হাওড়া।

কলকাতার পাতালট্রেন দমদম টু টালিগঞ্জ পর্যন্ত। খুব দ্রুত চলে। সাধারণত সময়ের হেরফের হয় না। পর্যাপ্ত বাতি ও পাখা আছে। কিন্তু টয়লেট এবং পানির ব্যবস্থা নেই। দরকার হয় না। পাতালরেলের স্টেশনগুলো বেশ পরিষ্কার। বইমেলা ও অফিস সময়ে প্রচণ্ড ভিড় হয়। তখন কিছু লোক মেয়েদের শরীরে হাত দেয় এবং পকেট সাবধান রাখতে হয়।

হাওড়া স্টেশনে এসে আমার *পূর্বা এক্সপ্রেস* ট্রেনে বসলাম। ট্রেনটির দৈর্ঘ প্রায় এক কিলোমিটার। প্রতি বগিতে মুখোমুখি ছয়জন বসতে পারে। আসনগুলো দিনের বেলায় চেয়ার, রাতে বেড হিসেবে ব্যবহার হয়। টয়লেট, পানি, আলো ও বাতাসের অভাব নেই। অর্ডার দিলেই খাবার চলে আসবে। চলে খুব দ্রুত। আমার সামনের আসনে ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে ও দুইটি ছেলে। তারা সবাই বৃটিশ। আমার পাশের দুজন হিন্দুস্তানি। রাত নয়টা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলো। রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে চেয়ারগুলোকে বেড বানিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি টপ বেডে, আমার সামনের মেয়েটিও টপ বেডে। রাত বারোটার দিকে ট্রেনের বাতি বন্ধ হলো।

ট্রেনে মদ বহন নিষিদ্ধ। পানির বোতলে কিছুটা নিয়েছিলাম। এবার সেটুকু খাওয়ার চেষ্টা করছি শুয়ে থেকে। অন্ধকারের সঙ্গে চোখ দুটি অ্যাডজাস্ট হওয়ার ফলে দেখতে পাচ্ছি নিচের বেডের ছেলেটি টপ বেডে উঠে মেয়েটিকে কিস করছে। তারপর মেয়েটির গেঞ্জি খুলে ফেললো। শুরু হলো এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ। এবার উঠলো মিডল বেডের ছেলেটি। সে বেশ সময় নিল শুধু কিস করার জন্য। তারপর শুরু হলো স্বর্গীয় খেলা। যখন ক্লান্ত হয়ে দুটি দেহ একে অপরের ওপর পড়ে থাকলো তখন জোক করে বললাম, আমার ভাগ কোথায়?

ছেলেটি উত্তর দিল, সরি। মেয়েটি আমাদের বন্ধু, কলগার্ল নয়।

*লাল পেয়ারি কা চায়ে, চায়ে লাল পেয়ারি কা...* শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

বুঝতে পারলাম বিহার চলে এসেছি। এখানে পশ্চিম বঙ্গের স্টাফ পরিবর্তন হবে। ট্রেনটি একটু সময় নেবে। টয়লেট থেকে হাত-মুখ ধুয়ে লাল পেয়ারি কা চা খেলাম মালাই মারকে। কপালে একটি চন্দনের তিলক দিলাম লম্বা করে। কারণ ট্রেনটি দীর্ঘক্ষণ বিহারের ওপর দিয়ে চলবে। বিহারের জনগণ ভাড়া ছাড়া এক স্টেশন থেকে উঠে আরেক স্টেশনে নামবে। যাত্রীদেরকে দাড় করিয়ে দিয়ে বিহারীরা বসবে। এরা আবার নামার সময় যাত্রীদের জিনিস চুরি করে নামে। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে নিয়ে নেমে পড়বে। পুলিশ কিছুই বলতে পারবে না। এই প্রদেশের মালিক লালু প্রসাদ যাদব। এই নেতার যুক্তি হলো *লাঠি যার মহিষ তার*।

ট্রেন চলতে শুরু করলো। আমি জানালার পাশে বসে হাতে খইনি ডলছি, মানে তামাক পাতা ও চুন। কোনো বিহারী আমাদের কাছে আসেনি যেহেতু আমরা তিনজনই হিন্দুস্তানি। আলীগড়ের মাঠে ময়ূররা পোকা-মাকড় খাচ্ছে, প্রাণ খুলে দেখছি। এরপর এলো নতুন দিল্লি।

ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরে এলাম *রাজধানী এক্সপ্রেস* ট্রেনে করে।

*বাড্ডা, ঢাকা থেকে*
radakol@yahoo.es

# মাসুদ রানার শিষ্য

- নুসরাত জাহান নূপুর

আমার এক পত্রমিতা আছে মৌলভীবাজার-এ। একবার ও আমাদের বরিশালে এসেছিল। সে আসার পর আমার আব্বু-আম্মুকে রাজি করিয়েছিল।

সে জন্য আব্বু-আম্মু ঠিক করেছিলেন মৌলভীবাজার যাবেন। সেখানে যাবার আরো এক উদ্দেশ্য ছিল সিলেট-এর সাধক পুরুষ হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহপরাণ (রহ.)-এর মাজার শরিফ দেখে আসা।

আমাদের বরিশালে ঢাকা যাবার ট্রেন লাইন নেই। তাই ট্রেন চড়া হয়নি। ট্রেন চড়ার সাধও পূরণ হয়েছিল। আব্বু তার কোর্টের কাজ জুনিয়রের কাছে দিয়ে মৌলভীবাজার যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

আমরা ২০০১ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ বরিশাল থেকে রাতে লঞ্চে উঠেছিলাম। ভোরে ঢাকা পৌছেছিলাম। আব্বুকে বলেছিলাম, ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত ট্রেনে যাবো।

জীবনের প্রথম ট্রেন চড়া, সিনেমা ছাড়া বাস্তবে ট্রেনে দেখা হয়নি।

সদরঘাট থেকে আমি আর মেরীআপু এক রিকশায়, অন্য রিকশায় আব্বু-আম্মু। রিকশা কমলাপুর রেলস্টেশন-এ থেমেছিল। সকালবেলা।

টিকেট কাউন্টারে যাবার পর আব্বু ফিরে এলেন। টিকেট পাননি। শেষে কালোবাজারিদের একজনের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে টিকেট কিনে নিয়ে এলেন। আমরা চারজন অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়লো। মেরীআপু আমাকে জানালার পাশে বসতে দিয়েছেন। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ট্রেন কমলাপুর রেলস্টেশন ছাড়ার দৃশ্যটি দেখলাম। যেন একটি সাপ হেলে-দুলে তার গর্ত থেকে বের হচ্ছে।

আব্বু-আম্মু বসেছেন সামনের সিটে। আমাদের বামপাশে দুটি তরুণ বসেছে।

মেরীআপু ট্রেনে পড়ার জন্য আগে থেকেই বই নিয়ে এসেছেন। আমি ওকে বলেছি, কোথাও জার্নি করার সময় যেন বই না পড়ে। তাতে চোখের ক্ষতি হয়।

মেরীআপু কখনো কথা শোনেননি। বাসে উঠেও বই পড়তে শুরু করেন। এবার ট্রেনেও বই পড়া শুরু করেছেন। এবং তার হাতে মাসুদ রানার নতুন বইটি ছিল।

জানালা দিয়ে তাকাতে তাকাতে চোখের পাতা ব্যথা করছিল। ট্রেনের ভেতর ভালো করে তাকালাম। প্রতিটি সিট লোকজনে ভর্তি। আমাদের বামপাশে দুটি তরুণ।

তরুণ দুটি আমাদের দিকেই তাকাচ্ছে। ওদের দিকে তাকাতেই ওরা চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। তরুণ দুটির একজন সিগারেট জ্বালালো।

আগের বাসেও দেখেছি তরুণী দেখলে তরুণরা পাবলিক প্লেসে ধূমপান করে। যেন ধূমপান করলে ওদেরকে হিরোর মতো দেখায়। একজন তরুণীর সামনে একজন তরুণ ধূমপান করলে তরুণীটি যে কতো বিরক্ত হয় তা জানতে পারলে কোনো তরুণ আর কখনোই কোনো তরুণীর সামনে ধূমপান করতো না।

মেরীআপুকে বললাম বই থেকে চোখ সরাতে।

মেরীআপু তা করলেন না।

বললাম, বই থেকে চোখ না তুললে বোতল থেকে পানি ঢেলে মাসুদ রানাকে গোসল করাবো। তাহলে মাসুদ রানা নেতিয়ে পড়বে।

এবার মেরীআপু আমার কথা বিশ্বাস করলেন। তিনি বই বন্ধ করলেন।

তাকে বললাম, এই পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার জন্য ওই পাশের তরুণ দুটিকে একটা শিক্ষা দিতে চাই।
মেরীআপু আতকে উঠে বললেন, আমি যেন তা না করি।
ওকে বললাম, বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। বিপদ হলে আমার অ্যাডভোকেট আব্বু তো আছেনই।
সিট ছেড়ে উঠে দাড়ালাম। ট্রেনের দুলুনি উপেক্ষা করে তরুণ দুটির পাশে গেলাম। সামনের সিটে আব্বু-আম্মু রয়েছেন। তরুণদের একজনকে (যে সানগ্লাস পরে ছিল তাকে) বললাম, আমার সিগারেটফোবিয়া আছে।
নীল শার্টওয়ালা তরুণটি বললো, সেটা কি?
বললাম, আমার চার হাতের ভেতর কেউ যদি ধূমপান করে তাহলে আমার বমি এসে যায়। এবং কমপক্ষে দশ মিনিট বমি হতে থাকে। আর নিজের বমির গন্ধে আমার নিজেরই খারাপ লাগে।
সানগ্লাসওয়ালা তরুণটি জিজ্ঞাসা কররো, সে এখন কি করতে পারে?
বললাম, ওরা দুজন আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে যদি তারা সিগারেট নিভিয়ে ফেলে বা সিগারেট বাইরে ফেলে দেয় তাহলে আমার বমি হবে না।
নীল শার্টওয়ালা তরুণটি সিট থেকে উঠে দাড়ালো।
মনে মনে আতকে উঠলাম। কি হবে কে জানে! কিন্তু না। পাচ সিট সামনে একজন গোফওয়ালা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললো, তিনিও তো সিগারেট টানছেন।
বললাম, তিনি ডেঞ্জার লাইন থেকে দূরে আছেন। মানে আমার চার হাতের ভেতর নেই।
এরপর ভদ্রতাবশত তরুণরা জ্বলন্ত সিগারেটগুলো চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল।
সিটে এসে বসলাম।
মেরীআপু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমাকে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এতো সাহস আমি কোথেকে পেয়েছি?
হাসি মুখ করে বললাম, তোমার মাসুদ রানার কাছ থেকে।
ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকাচ্ছি। আমার পত্রমিতাটি বলেছিল, আমি যদি ট্রেনে সময় কাটানোর জন্য কোনো কিছু না পাই তাহলে যেন ট্রেনের চাকার সঙ্গে গান গান খেলি। পত্রমিতাটি ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে যদি বলি *আমার নাম নূপুর* তাহলে দেখা যাবে ট্রেনের চাকাও একই সুরে *আমার নাম নূপুর* বলছে। পত্রমিতার কথা মতো মুখ নিচু করে বলতে লাগলাম, নূপুর পত্রমিতার দেশে যাচ্ছে। যতো বলছিলাম ততোই ভালো লাগছিল।
উন্মুখ ছিলাম, কখন পত্রমিতার কাছে পৌছাবো। এবং আমার জীবনের প্রথম ট্রেন যাত্রা সার্থক হবে। জীবনের প্রথম ট্রেন ভ্রমণ সার্থক হয়েছিল।

*বরিশাল থেকে*

# ঝুমকা

**- সৈয়দা পান্না হোসেন**

২০০১ সালে আমি, ফুপু ও সুমনচাচার সঙ্গে ঢাকা গিয়েছিলাম। ঢাকায় সাত রাস্তাতে আমার চাচার বাসা। জীবনের প্রথম ট্রেণ ভ্রমণ। চাচা চেয়ারকোচের টিকেট করেছিলেন। আমি ও আফসানা ফুপু পাশাপাশি বসেছিলাম। আমাদের সামনের চেয়ারে সুমনচাচা বসেছিলেন।
আমাদের বামপাশে দুই সিটে বসেছিলেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। মহিলাটি বসেছিলেন জানালার পাশের সিটে। মহিলাটির শরীর ভর্তি সোনার গহনা ছিল। কানে বেশ বড় ঝুমকা, গলায়ও ভারী অলংকার,

হাতে মোটা চুড়ি, এমনকি মাথার টিকলিটাও সোনার। মহিলার পাশের পুরুষটি যে ওনার স্বামী তা বলার জন্য শার্লক হোমস হতে হয় না। এবং এও বলে দেয়া যায় যে, তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে।

আমার ফুপু দুধ ছাড়া চা খান। ট্রেনে চড়ার পর আমারও মনে হয়েছে ট্রেনে দুধ চা খাওয়ার চেয়ে লাল চা খাওয়া অনেক ভালো। অবশ্য আমার মনে হওয়া যে সবারও একই মন মতো হবে তা বলছি না।

আমরা সোহেলচাচার বাসায় যাবার জন্য ঢাকা গিয়েছিলাম। চাচার জমজ মেয়ে দুটির জন্মবার্ষিকীতে যোগ দেয়ার জন্য গিয়েছি। শুধু এ জন্য নয়, সুমন চাচা ও আফসানা ফুপু আরো একটি উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা গিয়েছিলেন। তা হলো, সোহেলচাচার জমজ মেয়েদের মধ্যে বড় মেয়ে তাজিয়া-র সঙ্গে আমার ভাই মিশুর জন্য বিয়ের আলাপ হবে। এবং আশা হয়েছে, সোহেলচাচা এ প্রস্তাব ফেলে দেবেন না।

ট্রেন আখাউড়া স্টেশনে অনেকক্ষণ থেমেছিল। ট্রেনে ওঠার পর থেকেই দেখেছি আমাদের বামে জানালার পাশে সিটে বসা মহিলাটি জানালায় হাত রেখে থুতনি হাতের ওপর ভর দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিলেন। ট্রেন আখাউড়া স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছিল। এবং কয়েক সেকেন্ড পর গতি বেড়ে যাচ্ছিল। এক সময় গা-ভর্তি গহনাওয়ালা মহিলাটি হাত দিয়ে কান চেপে ধরে চিৎকার করে উঠেছিলেন।

দেখা গেল, মহিলার বাম কান থেকে রক্ত ঝরছে। এবং ওনার কানের ঝুমকা নেই। শোনা গেল, চোর বাইরে থেকে টান দিয়ে ওনার কানের ঝুমকা নিয়ে গেছে। সঙ্গে ওনার কানের লতিও নিয়ে গেছে।

দুই একজন বললেন, চোরটি নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলার এসব অলংকার দেখে টার্গেট করেছিল। এবং ট্রেনের গতি বাড়ার আগেই বাইরে থেকে টান দিয়ে ঝুমকা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

একজন প্রস্তাব দিলেন চেইন টেনে ট্রেন থামানোর জন্য।

অন্য একজন বললেন, ট্রেন থামিয়ে তো লাভ নেই। চোর তো পালিয়ে গেছে। ওকে তো পাওয়া যাবে না।

মহিলাটির দিকে তাকাতে আমারও খুব খারাপ লেগেছিল। অনেক রক্ত ঝরছিল কান থেকে। এবং সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল যা দেখে তা হচ্ছে, মহিলা আর কখনো দুই কানে দুল বা ঝুমকা পরতে পারবেন না।

*বড়ইউড়ি, মৌলভীবাজার থেকে*

# দেশে বিদেশে

**- ড. মাসুদ রহমান**

মেমোরি সার্চার দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি জীবনে প্রথম কখন ট্রেনে উঠেছি। তবে কিছু চমৎকার ট্রেন ভ্রমণের কথা হাজার বার মাউস ক্লিক করলেও ডিলিট করা সম্ভব নয়।

আমার অনেকগুলো বোন। বোনদের বিয়ে হলেই প্রথমে আমার ডাক পড়তো সঙ্গে যাবার। এমনি এক শুভক্ষণ শেষে আমার খোজ হলো ঝিনাইদহ জেলার কোটচাদপুরে যাবার জন্য। যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে ট্রেনই ছিল তখন মুখ্য। তখনো বাস ব্যবস্থা এতোটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। বরযাত্রীসহ নতুন বৌয়ের একমাত্র সঙ্গী আমি। হাটুকাদা ভেঙে আমরা পৌছালাম বারোবাজার ট্রেন স্টেশনে। বিকেল তিনটার লোকাল ট্রেন শেষ পর্যন্ত এলো সন্ধ্যা ছয়টার দিকে। ট্রেনে উঠলাম বেশ আনন্দের সঙ্গে।

একটু পরে বিশাল বপু বিশিষ্ট টিটি এলো। সবার টিকিট চেকের পর উদ্ধার হলো আমাদের জন্য কেউ টিকিট কাটেনি। বড়ই লজ্জার ব্যাপার আমার বোন তথা নতুন বৌয়ের জন্য। অনেক হাই কোর্ট আর জেলের ভাত দেখানোর পর কিছু বেশি টাকার *আক্কেল সেলামি*-র বিনিময়ে এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।

ট্রেনে যে কি পরিমাণ ভিড় হতে পারে তা কলকাতা কিংবা জাপানের টোকিওর ট্রেনে না উঠলে কল্পনা করাও অসম্ভব। বিয়ের আগেই একবার প্রেমিকার হাত ধরে দার্জিলিংয়ে পৃ-হানিমুনে গিয়েছিলাম। শিয়ালদহ থেকে

শিলিগুড়ি ট্রেন ভ্রমণে দুজনে প্রায় মরতে বসেছিলাম। বিশ টাকার বিনিময়ে সর্দারজির কাছ থেকে দুইটি সিট বুকিং পেলেও সিট পর্যন্ত পৌছাতেই মৃতপ্রায়। সিটে গিয়ে দেখি সর্দারজি সিট আরেকজনকে বিক্রি করতে উদ্যত।

অবশেষে আরো দশ টাকা বাড়িয়ে সিট উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। ট্রেনে ওঠার জন্য মানুষের এ যে অমানবিকতা তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝা দায়। টোকিওর ট্রেনগুলোতে একই রকম ভিড় থাকলেও অমানবিকতার ধরনটা একটু আলাদা। ভিড়ের মাঝে মহিলাদের বিভিন্নভাবে যৌন নির্যাতন পুরুষরা করে। এটা কম বেশি সব দেশেই আছে। জাতি হিসেবে জাপানিজরা বেশ ভদ্র হলেও আদিম স্বভাবে তারা মোটেও ভদ্র নয়। ট্রেনে ভিড়ের ফজিলতে মেয়েদের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোতে হাত দেয়া কিছু বিকৃত জাপানিজের এক রকম স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

উন্নত বিশ্বে বেশির ভাগ মেয়েরাই শর্ট স্কার্ট পরে। জাপানেও এর ব্যতিক্রম নয়। জাপানের লোকাল ট্রেনগুলোর সিট অনেক ক্ষেত্রে লম্বা বরাবর সামনাসামনি থাকে। তাই সামনের যাত্রীর স্কার্টের তলদেশে চোখ পড়তে পড়তে গন্তব্য স্টেশনে পৌছালে বেশ বিরক্তিই লাগতো প্রথম প্রথম। এখন অবশ্য চোখে মোহর এটে গেছে। জাপানিজ মেয়েদের যৌনতার টাইফুনেও তেমন একটা পরিবর্তন মনে হয় না।

ইওরোপ আর আমেরিকাতে ট্রেনে চুমোচুমি একটা মামুলি ব্যাপার। একবার লস এঞ্জেলেস থেকে ফিনিক্স আসছিলাম ট্রেনে। এখানে বলা উচিত, আমেরিকাতে ট্রেনের কদর কম থাকাতে ট্রেনের অবস্থাও তথৈবচ। এমনি এক ট্রেন ভ্রমণে, সামনের যুগলের চুমোচুমি দেখতে দেখতে ভুল করে কয়েক স্টেশন পরে গিয়ে নেমেছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বিলাসবহুল ট্রেন বলতে জাপানের *শিনকানসেন* এবং *ক্লার্লেসর ইওরোস্টার*–এর নাম না বললেই নয়। জাপানের শিনকানসেন ট্রেন ঘণ্টায় সর্বোচ্চ সাড়ে চারশ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। সাধারণত এরা প্রতি ঘণ্টায় তিনশ কিলোমিটারে চলে। শিনকানসেন মূলত তিন ধরনের। এরা হলো *নোজোমি*, *হিকারি* এবং *কোদামা*। এর মধ্যে কোদামা হলো কিছুটা পুরানো এবং কম গতির। নোজামিতে চড়ে জাপানের পশ্চিমের শহর ফুকুওকা (Fukuoka) থেকে টোকিও যেতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা। অথচ এর দূরত্ব এক হাজার দুইশ কিলোমিটারের উপর।

লন্ডনের ট্রেনে উঠলে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা উন্নত বিশ্বের ট্রেন। আমাদের দেশের মতো একই ঝাকুনি এবং শব্দ। আরো মজার ব্যাপার হলো, রেললাইনের চারপাশের দেয়াল লিখনও আমাদের মতো। এটা দেখলেই বুঝবেন আমরা তাদের সৃষ্টি। কেউ যদি ট্রেনের মধ্যে সব কিছুই আশা করে তার জন্য লন্ডন–প্যারিস–লন্ডন রুটের ইওরোস্টার–ই ভালো। তাদের সার্ভিস যেমন ভালো তেমনি বিভিন্ন বর্ণের এবং ধরনের যাত্রী। এখানে যেমন গতি আছে তেমন চুমোচুমিও।

জাপানে সাধারণত কোনো ট্রেনই এক মিনিটের জন্যও লেট করে না। কোনো কারণে দুই এক মিনিট দেরি হলে কতোবার যে ক্ষমা চায় তার ইয়ত্তা নেই। আর আমাদের এবং প্রতিবেশী দেশে ট্রেন দেরি হলে কতো মিনিট পর আসবে বা পৌছাবে তা জানানোর ভদ্রতাটুকুও দেখায় না। তাদের এবং আমাদের এটাই পার্থক্য।

*ফিকউশু, জাপান থেকে*
masudbitk@gmail.com

# ছত্রিশ টাকা

– মামুন

অনার্সে ভর্তির জন্য বোর্ডের কিছু কাগজপত্র প্রয়োজন যা আমাদের হাতে এখনো পৌছায়নি। তাই বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম রাজশাহী বোর্ডে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসবো।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল ছয়টায় আমি এবং কাঞ্চন বাসস্ট্যান্ডে রওনা দিই। বাকি বন্ধুরা সেখানেই উঠবে।

রিকশাচালক জানালো, সকালের বাস শহরের ভেতর থেকেই ছাড়ে।

তাই মুক্তির মোড় নেমে বাস ধরলাম।

এদিকে বাস ছাড়তে দেরি করায় আমরা বাকি বন্ধুদের টেনশনের কথা ভেবে হাসাহাসি করলাম।

বাস ছাড়লো। স্ট্যান্ডে বাকি বন্ধুরা উঠলে জানতে পারলাম সুমন যার মতে রাজশাহী যাওয়া মানে টাকার শ্রাদ্ধ সে আমাদের দেরি দেখে গালের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

অন্য বন্ধুদের মতে, ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া উচিত।

যাহোক, বোর্ডে গিয়ে একদিনের মধ্যে কাগজপত্র বের করতে কর্মচারীরা কিছু টাকা খেলো।

কাজ শেষে শিক্ষা বোর্ডের দূষিত পরিবেশকে আরো দূষিত করার জন্য সারি বেধে দেয়ালের পাশে দাড়িয়ে গেলাম। সেখান থেকে সাহেববাজার ঘুরতে বেরিয়ে তিনজনকে হারিয়ে ফেললাম। ভাবলাম খেয়ে নিই, তাদের নিশ্চয় রেলস্টেশনে পাবো।

এদিকে তারা জিরো পয়েন্টে খোজাখুজি করে আমাদের হোটেলে দেখতে পেল এবং খাবার টেবিল থেকে তুলে অন্য একটি ভালো হোটেলে নিয়ে গেল।

সুমন টাকা বাচানোর জন্য কি খেলো সেই জানে।

এদিকে দুইটার ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলো। আমরা দ্রুত স্টেশনে পৌছাই।

এ সময় সুমন বললো, দোস্ত, প্রকৃতি ডাকছে।

লিখন বললো, পাবলিক টয়লেটে যা, এক টাকা নেবে।

সুমন তো অবাক, এই ছোট্ট কাজের জন্য এক টাকা নেবে!

বললাম, তাহলে ট্রেনেই করিস।

সে তাতে রাজি হয়।

টিকেট কাউন্টারে টিকেট চাইলে ও প্রান্ত থেকে বললো, ট্রেন আছে কি না আগে দেখে এসো।

একজনকে টিকেট কাটতে দিয়ে আমি এবং লিখন ট্রেন দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি ট্রেন হাটা শুরু করেছে। বাকি বন্ধুদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে ট্রেনে উঠে পড়লাম। দরজা দিয়ে দেখলাম টিকেটসহ অন্য বন্ধুরা শেষ কম্পার্টমেন্টে উঠেছে। তাই সেই দিকে হাটা ধরতেই মাঝ পথে টিটি আমাদের টিকেট চাইলেন।

আমরা বললাম, বন্ধুর কাছে আছে।

টিটি বললেন ও, তোমরা সাতজন।

উত্তরে বললাম, হ্যা।

এরপর যতোবার টিটির সঙ্গে দেখা হলো ততোবার হেসে বললেন, সাতজন। এবং ট্রেনের অর্ধেক যাত্রীর কাছে আমরা *সাতজন* নামে পরিচিত হলাম।

বাকি বন্ধুদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, দেখলাম সুমন নেই।

সোহেলকে জিজ্ঞাসা করতে বললো, চাপ সহ্য করতে না পেরে পাবলিক টয়লেটে গেছে। তাই ট্রেন মিস করেছে।

এ কথাতে গোটা কম্পার্টমেন্টে হাসির রোল পড়ে গেল।

টয়লেট চার্জ এক টাকা তো গেলই, সঙ্গে গেল পয়ত্রিশ টাকার টিকেট।

এরপর থেকে সবাই তাকে খ্যাপাতে লাগলাম, হায়রে সুমন, তোর মলমূত্রের দাম ছত্রিশ টাকা!

*নওগা থেকে*

# ইওরো টুর

- আখন্দ বাবু

ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সিংগাপুর এয়ারলাইনস–এ সিংগাপুর ট্রানজিট নিয়ে সরাসরি ভিয়েনা এসে পৌছলাম স্থানীয় সময় নয়টায়। জীবনের প্রথম ইওরোপে পা রাখা। ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে ওয়েটিং লাউঞ্জে এসে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষমাণ সমবয়সী দুই বন্ধুর দেখা পেলাম। আমরা চার বন্ধু একই দিনে একই ফ্লাইটে এসে পৌছি। দুই কাজিন আগে থেকেই এখানে ছিল।

পরিচিতজন থাকলে নতুন দেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়। যে দেশের ভাষার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই, কিছু বোঝার উপায় নেই সেখানে প্রথম প্রথম বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত।

ভিয়েনা এয়ারপোর্টটি ভিয়েনা শহরের বাইরে, ঊনিশ কিলোমিটার দক্ষিণ–পূর্বে। এয়ারপোর্টের যাত্রীরা যাতায়াত করে সাধারণত ট্রেন, ট্যাকসি বা বাসে। তবে সবাই ট্রেনে যাতায়াত করতেই বেশি পছন্দ করে। আমাদের গন্তব্য যেহেতু ভিয়েনা সেহেতু ট্রেনেই যেতে হবে।

লাগেজ নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম বন্ধুদের পেছনে পেছনে। বিশ মিনিটের ট্রেন জার্নি। এই বিশ মিনিটের পথ অতিক্রম করতে বাংলাদেশে দুই ঘণ্টায় পারা যেতো কি না সন্দেহ আমার।

ট্রেনের ভেতরে ঢোকার পর সহজেই বোঝা যায় উন্নত দেশের উন্নত ট্রেন। বসার আসনগুলো সোফা সাইজের। প্রতিটি স্টেশন আসার আগে নিজেস্ব ভাষায় ঘোষণার মাধ্যমে কোন স্টেশনে এলো, এখানে কি কি পরিবহন পাওয়া যাবে যাত্রীদের সুবিধার্থে আগাম বলে দেয়া হচ্ছে। তবে আমার যেহেতু প্রথম দিনকিছুই বোঝার উপায় নেই। বোঝার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কারণ সঙ্গে এ দেশে আগে থেকে থাকা দুই বন্ধু।

এয়ারপোর্ট থেকে শহরে আসার পর শহরের টিউব অর্থাৎ সাবওয়ে ট্রেনে (পাতালট্রেন) আগে থেকে ঠিক করা বাসায় এসে উঠলাম। পাতালট্রেনের ব্যবস্থাও চোখে পড়ার মতো। এক স্টেশন থেকে পরবর্তী স্টেশনে যাওয়ার দূরত্ব এক মিনিটের বেশি হবে না।

প্রথম বাসায় আসার পর সমবয়সী দুই চারজনের সঙ্গে আলাপ হলো। একজন প্রশ্ন করলো, এয়ারপোর্ট থেকে কিভাবে এলেন?

বললাম, ট্রেনে।

সঙ্গে থাকা দুই বন্ধু বলে বসলো, *সোয়ার্স ফারেন* করে নিয়ে এলাম। অর্থাৎ বিনা টিকেটে ইওরোপের ট্রেনে প্রথম ভ্রমণ।

আমার জীবনে ট্রেন ভ্রমণ খুব কমই হয়েছে। এসএসসি পাস করার পর রাঙামাটি যাবো, চট্টগ্রাম হয়ে ট্রেনে। আমার ছোট চাচা চাকরির সুবাদে দীর্ঘ দিন রাঙামাটিতে ছিলেন। তারা ঢাকা বেড়াতে এলে তাদের অনুরোধে রাঙামাটি রওনা হলাম। সঙ্গে চাচাতো বোনরা ও চাচি। বাংলাদেশের ট্রেনের কোনো অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। রাত দশটায় ট্রেনে উঠে বসলাম। সারা রাত ট্রেন জার্নি উপভোগ করতে লাগলাম। জীবনের প্রথম ট্রেনে চড়া।

হঠাৎ খেয়াল করলাম কিছুক্ষণ পর পর ট্রেন থামছে এবং দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থাকছে। যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সেহেতু চাচাতো বোনকে প্রশ্ন করলাম, কি রে, কিছুক্ষণ পর পরই ট্রেন থামছে কেন?

ঝটপট উত্তর, যাত্রীদের বাড়িতে বাড়িতে নামাতে হয়, তাই কিছুক্ষণ পর পর থামছে, যাত্রী ওঠানো ও নামানোর কারণে।

বোকা হয়ে গেলাম।

চাচি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, এটা *মেল ট্রেন*, এটার অবস্থা এ রকমই।

এটা ছিল ১৯৮০ সালের কথা। এখন অবশ্য বাংলাদেশে ট্রেন ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু আর কোনোদিন চড়া হয়নি।

ইওরোপে থাকার সুবাদে অনেক দেশ ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে অনেকবার। অস্ট্রিয়াকে ইওরোপের হার্ট বলা হয়। কারণ এর ভৌগোলিক অবস্থান ইওরোপের মাঝখানে। এখান থেকে ট্রেনে যে কোনো দেশে ভ্রমণ করা খুবই সহজ।

১৯৯২-তে দুই ভাই চেপে বসলাম ইওরো ট্রেনে জুরিখ যাবো বলে। এটাই প্রথম লম্বা ট্রেন ভ্রমণ। সারা রাত চলবে ট্রেন। সঙ্গে কি নিতে হবে তার প্রস্তুতির শেষ নেই। ব্যাগ ভর্তি হালকা পানীয় আর নানান ধরনের খাবার। রাত তো পার করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময় ট্রেন ছাড়লো। এক মিনিটের কোনো লেট নেই। নির্দিষ্ট আসনে জানালার পাশে বসলাম। ট্রেন ছাড়ার পর দেখা গেল ট্রেন ফাকা। ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝি বা ভুল ট্রেনে উঠেছি। কিন্তু না, ট্রেন ঠিকই আছে। আমাদের দেশের মতো এতো গাদাগাদি, আসন নিয়ে মারামারি নেই এখানে। জানালার পাশে বলে মনোরম রাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে দুই তিন ঘণ্টা কেটে গেল।

একটু হাটবো বলে আশপাশের বগিগুলোতে নজর রাখলাম। অবাক হয়ে দেখলাম সব যাত্রীরা ঘুমাচ্ছে। কারো কোনো আগ্রহ নেই রাতের এই দৃশ্য দেখার। দুই একজন যারা জেগে আছে, হাতে ম্যাগাজিন।

আমরা দুই ভাই সঙ্গে আনা চিপস, বাদাম, ড্রিংকস ঝুলন্ত টেবিলে সাজিয়ে বসলাম।

ট্রেন চলছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, কখনো বা পাহাড়ের ভেতর টানেল দিয়ে। মাঝে মধ্যে পাহাড়ের নিচে হরিণ দেখা গেল। এভাবে কখন যে জুরিখ এসে পৌছেছি টেরই পেলাম না।

আরামদায়ক ভ্রমণ! ক্লান্তি বলতে কিছু নেই। শুধু রাত জাগার কারণে অল্প মাথা ব্যথা।

এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনে ট্রেনে চেপে অনেক দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি।

দেশ থেকে যারা ইওরোপে আসেন তারা ইওরোপের এক দেশ থেকে আরেক দেশ দেখার জন্য ইওরো ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন যদি সময় ও সুযোগ থাকে। ইওরো ট্রেনে ভ্রমণ সত্যিই আরামদায়ক।

গত বছর সস্ত্রীক দুই বাচ্চা নিয়ে ইটালির ভেনিস শহর দেখার উদ্দেশ্যে ট্রেনের টিকেট করলাম। একটু যেন আরামদায়ক ভ্রমণ হয় সে জন্য ট্রেনের স্লিপিং কারে রিজার্ভেশন দিলাম। আমরা যদিও চারজন তবুও শোয়ার ব্যবস্থা তিনজনের। ছোট মেয়ের যেহেতু টিকেট লাগবে না সেহেতু বেডের কোনো ব্যবস্থা নেই।

আমি সবার উপরে, মাঝের বেডে ছেলে, নিচেরটিতে মা ও মেয়ে শুয়ে পড়লো। রুমে নানান দেশি আরো তিনজন যাত্রী ছিল। সিকিউরিটির কোনো অভাব নেই। তাই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

ইচ্ছা ছিল রাতের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে ভেনিস পৌছার। কিন্তু ট্রেনের বেডে গা হেলান দেয়ার পর ঝুক্কুর ঝুক্কুর ট্রেনের আওয়াজ ও দোলাতে কখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ভোরে ট্রেনের টিটি-র ডাকে ঘুম ভেঙে দেখি ইটালিতে প্রবেশ করেছি আর এক ঘণ্টা পরে ভেনিস পৌছাবো।

টিটি সবার পাসপোর্ট যার যার কাছে ফেরত দিয়ে শুভ ভ্রমণ, সুন্দর হোক বেড়ানো, বলে বিদায় নিলেন।

আমরাও ভেনিস এসে পৌছালাম। স্টেশন থেকে বের হয়ে ভেনিস-এর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

*ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া থেকে*

# চেয়ে চেয়ে দেখলাম

**- এস এম আবদুল খালেক**

একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে চার সপ্তাহের ট্রেনিং কোর্সে অংশ নেয়ার জন্য মনোনীত হয়েছি। উত্তরবঙ্গের ষোলটি জেলা এবং টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা থেকে বাইশজন প্রশিক্ষণার্থীর অংশ নেয়ার কথা।

আমরা আগের দিন বিকেলেই জামতৈল স্টেশন থেকে *আন্তনগর ট্রেন পদ্মা*-য় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। লাহিড়ী মোহনপুর স্টেশন পার হতেই হেমন্তের পড়ন্ত বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।

ট্রেনের জানালায় পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজ ধান ক্ষেতগুলোর উপরে দিয়ে এক ঝাক শাদা বক উড়ে যাচ্ছে। কৃষকেরা সারা দিন কাজ শেষে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে। রেললাইনের ধারে জলাশয়গুলোতে বেশ কিছু পাখি তখনো নীড়ে ফেরার অপেক্ষায় জলকেলি করছে। সন্ধ্যার ঝিরিঝিরি বাতাসে ট্রেনের ঝিকমিক শব্দে জানালার পাশে তাকিয়ে সবুজের সমারোহে দৃশ্যাবলী দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। মনে পড়লো ছোটবেলায় পড়া কবি সুফিয়া কামালের সেই *সাঝের মায়া* কবিতাটির কথা।

গোধূলি লগ্নে পশ্চিম আকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে লাল সূর্যটি অস্তমিত হয়ে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এলো। ট্রেন চলছেই।

যথাসময়ে আমরা রাজশাহী স্টেশনে পৌছে গেলাম। সেখান থেকে রিকশায় করে লক্ষ্মীপুর মোড়ে আমাদের নিজস্ব হোটেলে গিয়ে উঠলাম। পরের দিন থেকে ট্রেনিং শুরু। এক সপ্তাহ বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল।

বিকেলে পদ্মার পাড়ে চিড়িয়াখানা, ইউনিভার্সিটি, সাহেববাজার, একেকদিন একেক জায়গায় বেড়াতে যাই।

পরের সপ্তাহের শেষ দিন বৃহস্পতিবার। রাজশাহী স্টেশন থেকে *মেল ট্রেন*-এর টিকেট কেটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

ঈশ্বরদী জাংশনে পৌছার পর আমার সহকর্মী সাইফুল বললেন, ট্রেন এখানে আধা ঘণ্টা লেট করে ইঞ্জিন ঘোরাবে। এই সময়ে আপনি পনেরো মিনিটের মধ্যে খাওয়া সেরে ট্রেনে চলে আসবেন। তারপর আমি খেতে যাবো।

তার কথা মতো ওভারবৃজ পার হয়ে পূর্ব পাশে হোটেলে খাওয়ার জন্য চলে গেলাম। যেহেতু খেয়ে ফেরার পরে তিনি খেতে যাবেন, তাই খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ট্রেনে ফেরার জন্য ওভারবৃজে উঠে এলাম। হঠাৎ ডানদিকে বৃজের উত্তরপাশে তাকিয়ে দেখি একটা ট্রেন হুইসল বাজাতে বাজাতে ধুয়া ছেড়ে বীরবিক্রমে সিরাজগঞ্জের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বামদিকে বৃজের নিচে প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে দেখি আমাদের মেল ট্রেনটি নেই। অর্থাৎ স্টেশন ফাকা। ট্রেন আমাকে না নিয়েই চলে গেছে।

পাশে দাড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ওই ট্রেনটিই সিরাজগঞ্জ মেল ট্রেন যেটা এই মাত্র ছেড়ে গেছে।

ওই তো এখনো দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে ওভারবৃজের ওপরে থ মেরে দাড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

মনে পড়লো গানের সেই কলি, *আমার বলার কিছু ছিল না। চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে, তুমি চলে গেলে।*

ট্রেনে আমার ব্যাগ রয়েছে। অবশ্য সাইফুল হয়তো জামতৈল স্টেশনে আমার ব্যাগটি নামিয়ে নেবেন এবং বাসায় পৌছে দেবেন।

কিন্তু আমি এখন যাবো কিভাবে? আজ বাড়ি গিয়ে কালকেই আবার রাজশাহী ফিরে আসতে হবে। পকেট থেকে টিকেটটি বের করে বার বার তাকিয়ে দেখলাম আর চলে যাওয়া ট্রেনটি যতোক্ষণ দৃষ্টিসীমার বাইরে গেল ততোক্ষণ দেখলাম। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ওভারবৃজ থেকে বিষণ্ন মনে, ভগ্ন হৃদয়ে, প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম।

পরবর্তী লোকাল ট্রেনটি রাত সাড়ে আটটায় ছেড়ে যাবে। তার মানে আমাকে প্রায় পাচ ঘণ্টা স্টেশনে বসে থাকতে হবে। যদি বাসে যেতে চাই তাহলে পাবনা হয়ে ঘুরে যেতে অনেক সময় লাগবে।

অবশেষে রাতের ট্রেনেই যাবো স্থির করে স্টেশনের পূর্বপাশে আমার চাচার বাসায় চলে গেলাম। সেখান থেকে রাত সাড়ে আটটায় পুনরায় স্টেশনে এসে লোকাল ট্রেনে রওনা দিলাম।

জামতৈল পৌছাতে প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেল। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা, মা, আমার জন্য অনেকক্ষণ জেগে থেকে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছোট ভাইবোনরাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার স্ত্রী আমার জন্য খাবার ঢেকে রেখে বই পড়তে পড়তে অল্পক্ষণ আগে বুকের ওপর বই রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ব্যাগ দেখলাম সন্ধ্যার আগেই বাসায় পৌছে গেছে।

শুধু বেরসিক মেল ট্রেনটি ঈশ্বরদী ওভারবৃজে আমাকে রেখে চলে আসায় সন্ধ্যা ছয়টার পরিবর্তে রাত সাড়ে বারোটায় আমাকে বাসায় পৌছাতে হলো।

কারণ যেহেতু আমার বলার কিছু ছিল না, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম, মেল ট্রেনটি চলে গেল।

*জামতৈল, সিরাজগঞ্জ থেকে*

# পরের যাত্রা

**- রকিবুল করিম**

আজ থেকে প্রায় ১৯ বছর আগের কথা। ১৯৮৫ সাল। দিনক্ষণ মনে পড়ে না। তবে স্মৃতিগুলো আজো ভেসে আসে এবং মাঝে মধ্যে কারোর কাছে এ গল্পটি বলি। *নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা*।

ভ্রমণটির শুরু ছিল কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলস্টেশন থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। ঘটনাটি যদিও মানানসই নয় তবুও তো বেশ ভালোই লাগে।

আমি, আমার বৃদ্ধ বাবা আর সঙ্গে পাচ নাম্বার বোন পোড়াদহ রেল স্টেশন থেকে সোয়া দুইটায় যাত্রা শুরু করি সুদূর চট্টগ্রাম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন কোনো *আন্তঃনগর ট্রেন* ছিল না। তাই মেইল টেনে করে বাহাদুরাবাদ ঘাট হয়ে চট্টগ্রাম আসতে হতো। বাড়ি থেকে কিছু খাবার নিয়ে রওনা হতে হতো। কেননা রাস্তায় খাবারের পরিবেশ থাকতো না।

এরই মাঝে এক এক করে পাবনা, ঈশ্বরদী জংশন, উল্লাপাড়া হয়ে ঘাটে পৌছালাম। তারপর ওপারে গিয়ে তাড়াহুড়া করে ট্রেনে উঠলাম উঠে দেখি বসার কোনো জায়গা নেই।

ঘাটের কুলিরা সিট দখল করে বসে আছে এবং সে সিটগুলো তারা একটি নির্দিষ্ট দামে বেচা কেনা করছে। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার মতো কারোর সাহস নেই। নিরুপায় হয়ে আমার বাবা তিনটি সিট কিনলেন। কিছু টাকা দিয়ে তিনজনের বসার জন্য।

এরপর আমরা তিনজন বসলাম। এরই মাঝে আমি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা আর মনে নেই। ট্রেনের গতিতে ট্রেন চলছে এবং সে প্রতিটি স্টেশনে থামছে। মাঝে মধ্যে কানে আসে এই ডিম আছে, এই কলা আছে ইত্যাদি। আছে কান ঝালাপালা করার মতো ডাক।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় হই হুল্লার কারণে। চেয়ে দেখি কুমিল্লা স্টেশনের নেমপ্লেট। সেখান থেকে প্রচুর লোক ট্রেনে উঠছে, সবাই চট্টগ্রাম যাবে।

রেলের চাকরির সুবাদে বেশির ভাগ যাত্রীই সরকারি চাকরি মোতাবেক ট্রেনের পাস পেয়ে থাকেন। সেই কারণে একজন ভদ্রমহিলা তার জনাচারেক ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের সেকেন্ড ক্লাসে উঠলেন।

তাছাড়া কেউ কাউকে প্রশ্ন করছেন, ভাই, আপনি কি এই ক্লাসের যাত্রী?

কি যে তাদের ব্যবহার যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। *ধুর মিয়া* রাখেন আপনার ক্লাস। আমরা কি চিটাগাং যাবো না?

সে যাই হোক, এখন বসার পালা। এতোগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে মা কোথায় বসবে? কেউ কি আর নিজের সিট ছেড়ে দিতে চায়?

এর মাঝে আমার বাবা আমাকে বলেন, বাবা, তুমি একটু সরে বসো, ওনাকে বসতে দাও।

বাবার কথা অমান্য করার মতো নয়। তাই বাবার কথা অনুযায়ী মহিলাকে বসতে দিলাম।

শোনা গল্প খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর মতো একখানা হরিণের চামড়ার জায়গা দিলে চলবে। সে চলা নাকি আজো ইতিহাসের পাতায় বিরাজমান। ঠিক সে রকমই মহিলাটি এক এক করে তার সেই চারজন সন্তান বসালেন আমাদের কৌশলে চেপে চেপে। আমার বাবার সরলতার সুযোগ নিয়ে তিনি তার বসার সিদ্ধি হাসিল করলেন।

শেষমেশ আমার বাবার বসার জায়গা নেই। আমি আমার বাবার কোলের ওপর অর্ধেক আর অর্ধেক বোনের কোলের ওপর। সেটাতেও তিনি খুশি নন। তাই এবার এক এক করে নিজেদের দুটো সিট ছেড়ে দিতে হলো সেইখানে দজ্জাল মহিলার অত্যাচারে।

কি যে তার বাচনভঙ্গি, তেমনই তার ব্যবহার!

দ্বিতীয় দিন বিকাল সাড়ে চারটায় ট্রেন চট্টগ্রাম এসে পৌছায় এবং সে মহিলাকে বসার জায়গা দেয়াতে বাবাকে বললাম, *বাবা, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা জীবনে কোনোদিন আর কারোর জন্য করো না।*

আমার কথা শুনে আমার বোন আমার মুখ চেপে ধরে ফেলে এবং বুঝতে পারলো আমি সেদিন ওই উক্তিতে কি বোঝাতে চেয়েছি।

*বন্দর, চট্টগ্রাম থেকে*

# উপলব্ধি

**- গোলাম সাইদ**

টেরিয়াল থেকে বাড়িয়াঢালা এক কিলোমিটার পথ। বছর অন্তর দুই একবার এখানে আসা হয় আমার। প্রথমে বাড়ি থেকে টেরিয়াল হোটেলে বসে চা পান করা, তারপর রেললাইন ধরে বাড়িয়াঢালা স্টেশন অথবা একটু পাহাড়ের দিকে হেটে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসা। প্রতিদিনকার ঘুম ভাঙা বিকেল এভাবেই কেটে যায়।

বাড়িয়াঢালা স্টেশন কিছুটা ভৌতিক লাগে। কতো ট্রেন আসতে যেতে দেখি। কিন্তু কোনোদিন থামতে দেখিনি। যাত্রী ছাউনির পাশে একটি রুম। কোনো রেল কর্মকর্তার আবাস অনুমান করা যায়। তার দেখাও মেলেনি। হয়তো বিকেলটাতে থাকেন না তিনি।

এক বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বেরুতেই শিখার সঙ্গে দেখা। শিখা এ বাড়িরই মেয়ে। ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা খুব। ছোট্ট করে হেসে জিজ্ঞাসা করলো, ঘুম কেমন হলো?

ঘুম ভাঙতেই চমৎকার হাসি মাখা মুখ দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়। বলালাম, ভালো।

টিউবওয়েল থেকে মুখ-হাত ধুয়ে চুল আচড়ে বাইরে বের হবো। তখনি শিখা সামনে এসে হাজির।

তুই প্রতিদিন কই যাস? আমিও যাবো তোর সঙ্গে।

শিখা আমার বয়সে ছোট হলেও আমাকে তুই বলে। বাধা দিই না। ভালোই লাগে শুনতে।

চল। কিন্তু আসতে দেরি হলে আমার দোষ নেই।

এই শর্তে রাজি হলো যেতে আমার সঙ্গে যেন দেরি হওয়া ওর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার।

শিখা কোনো রকম দূরত্ব বজায় না রেখেই হাটছে আমার সঙ্গে। প্রাপ্ত বয়সেও শৈশবের উচ্ছলতা ওর চোখে-মুখে। দেখতে ভালোই লাগে। মাঝে মধ্যে ভাবি, ও আমার প্রতি দুর্বল কি না, ওকে বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু যেখানে সীমারেখা নেই সেখানে অন্ত খোজা বৃথা।

এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিই। থাক না যে যার মতো। তবে এটুকু বুঝি, ও আমাকে বিশ্বাস করে, পছন্দ করে। বিশ্বাস না থাকলে আমার সঙ্গে একা বেরুতো না।

আমি আর শিখা পাশাপাশি হাটছি। আজকে শিখাকে অন্য রকম লাগছে। এমনিতে ও সুন্দরী। পাতলা গড়ন, ফর্শা মুখ।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে শিখা প্রশ্ন করলো, তোর স্পেশালি কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই?

তুই স্পেশালি কারো সঙ্গে বলতে যা বোঝাতে চাচ্ছিস এমন কেউ নেই।

শিখা হাটছিল মাটিতে চোখ রখে।

কাউকে ওরকম ভালো লাগেনি?

লেগেছে। কিন্তু কখনো মুখ খুলে বলিনি। তবে ইদানীং একটি মেয়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হয়েছে। তাকে বলেছিলাম, তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। তোমাকে আমার ভালো লাগে। এটা শুধু ভালো লাগা পর্যন্তই। কারণ তার সঙ্গে কোনো পরিণতির সম্ভাবনা খুবই কম।

শিখার দিকে তাকালাম। মুখ মলিন। তখনো চোখ মাটির দিকে। বুঝতে পারলাম না আমার কারো সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া না হওয়া ওর মুখ মলিনের কারণ কি না।

শিখা, মুখ অমন করে আছিস কেন? তোর হাসি মুখ খুব সুন্দর, সব সময় হাসি-খুশি থাকবি।

বলতেই মাটি থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে শিখা উদাসীনভাবে সামনে তাকালো।

আসলে নারীদের বোঝা দুঃসাধ্য। এ প্রসঙ্গে আর এগোয়নি। এরই মাঝে রেললাইনে পৌছে যাই।

দুজন রেললাইনর ওপর দিয়ে হাটছি।

শিখা বললো, চল, একটা মজার খেলা খেলি। তুই এক লাইনে হাটবি আর আমি এক লাইনে হাটবো। যে আগে পড়বে সে হেরে যাবে।

লাইন বলতে রেল পথের দুপাশে দুটো লোহার দীর্ঘ লাইন।

হাটা শুরু করলাম দুজন। আমি অভ্যস্ত না। ডানে বামে হেলে হাটছি। পড়ে যাবার উপক্রম। ও স্বাভাবিকভাবে হাটছে। হঠাৎ পায়ের তলায় লোহা কাপছে।

ও আমাকে বললো, মানিকদাদা পায়ে সুরসুরি লাগছে?

হ্যা। আমি বললাম।

এমনভাবে প্রতিযোগিতা করছি যেন হেরে গেলে বড় রকম ক্ষতি হয়ে যাবে। কে আগে হারবে? কাউকে না কাউকে তো হার মানতেই হবে। পায়ের তলায় লোহার কাপুনি আরো বেড়ে গেল। সামনে তাকাতেই বুঝলাম, আমরা যে লাইনে হাটছি তার ওপর দিয়ে ট্রেন আসছে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দপদপ করে উঠলো।

ট্রেন ক্রমেই সামনে তেড়ে আসছে। আমার কি করণীয় বুঝে উঠতে পারছি না। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

শিখাও ভীত, হতবাক। ঝট করে ও আমার ডান হাত শক্ত করে ধরে ফেললো।

আমার করণীয় কি? ট্রেন কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। কি করছি জানি না। শিখাকে হ্যাচকা টান দিয়ে পড়ে গেলাম রেললাইনের পাশের নিচু জমিতে।

কাদায় মাখামাখি হলাম।

শিখা সহজ হতে পারছিল না। আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

কয়েক সেকেন্ড আগে মন স্থির না করলে ঘটে যেতো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। ও এখনো বুকের মাঝে।

অপূর্ব অনুভূতি।

বুকে বুক লেগে আছে যেন বনের মাঝে এক দিশাহারা হরিণী তার আশ্রয় খুজে পেয়েছে। দুজনার বুকে এক অদ্ভুত অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। হঠাৎ আমার মনে হলো কোথাও কোনো শিশু গোঙাচ্ছে। নাকি শিখাই কাদছে। ওর শরীরের কাপুনি সাগরের ঢেউয়ের মতো বালুকাবেলায় আছড়ে পড়ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর মুখ আমার ডান পাজরে ঠাই নিয়ে আছে।

ওর ছোট্ট মুখখানা আলতো করে তুলতেই দেখি, গাল বেয়ে অশ্রুধারা অঝোর বেগে গড়িয়ে পড়ছে।

আর তখনি সত্যটা উপলব্ধি করলাম।

শিখা আজ সেজেছিল হালকা সাজে, চোখে কাজল, সালোয়ার-কামিজের সঙ্গে ঠোটে ম্যাচিং লিপস্টিক, কপালে ছোট্ট লাল টকটকে টিপ।

সাধারণ সাজে লাগছিল তাকে অপরূপা।

কিন্তু ও কাদছে কেন? এ কান্না কিসের? একটু আগে বড় রকম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার, নাকি অন্য কিছুর জন্য?

*মিরপুর, ঢাকা থেকে*

# খাইবার মেইল

**এএন ওয়াহিদ**

পাকিস্তানের করাচি থেকে একটা ট্রেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার পর্যন্ত যায়। তাকে *খাইবার মেইল* বলা হতো। সেই ষাট শতকের কথা। তখন পেশোয়ারে কর্মরত ছিলাম। থাকতাম পেশোয়ার ক্যান্ট-এ।

তখনকার ঢাকায় ছুটি কাটিয়ে কাজে ফিরে যাচ্ছিলাম প্লেনে ঢাকা থেকে লাহোর। সেখান থেকে ট্রেনে পেশোয়ার উদ্দেশ্যে লাহোর রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু।

শীতকাল শুরু হয়েছে। রিজারভেশন করা ছিল। যথাসময় ঐতিহাসিক লাহোর রেলস্টেশন থেকে ট্রেনটি ছেড়ে ছিল।

একা যাচ্ছি। পরিবার ঢাকা রয়ে গেছে।

ট্রেনে রাতে শোয়ার ব্যবস্থা আছে এমন সিট বুক করা হয়েছিল। পুরা কমপার্টমেন্টে মাত্র চারটি সিট। দুটো নিচে আর দুটো উপরে। আমার সিট পড়েছে উপরে। আমার নিচের সিটে একজন পাঞ্জাবি পালোয়ান টাইপ শরীর। অন্য পাশের এক সিটের নিচে এক তরুণী, বয়স ষোলর বেশি হবে না। সুন্দরী, সুদেহ, নাক-মুখ দেখতে পাঠানিদের মতো। তার সঙ্গে এক বুড়ো, তিনি আপার বার্থে শুয়ে আছেন। বগির লাইট বন্ধ। মাঝে মধ্যে বাইরের আলো জানালা দিয়ে আসছে।

নিচের ভদ্রলোক ইচ্ছা করেই একটা জানালা খুলে রেখেছিলেন।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

উল্টোদিকের বুড়ো লোকটি ইনডিয়া থেকে এসেছেন। তার সঙ্গে মেয়েটি নাকি তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী। মেয়েটি নাকি বম্বে (মুম্বাই) থেকে এসেছে। তারা পেশোয়ার-এর আগেই এক স্টেশনে নেমে পড়বেন। এসব কথা ভ্রমণের শুরুতেই জানা হয়ে গিয়েছিল।

সহযাত্রী পাঞ্জাবি ভদ্রলোকটি না ঘুমিয়ে ছটফট করছেন আর কোণাকোণিভাবে সেই মেয়েটির দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছেন।

আমিও গরম চাদর গায়ে দিয়ে চোরা চোখে সেদিকে দেখছি। হঠাৎ দেখা গেল যে, বুড়ো লোকটি নিচের সিটে তার স্ত্রীর কাছে চলে এলেন। সিটে পাশাপাশি শোয়া যায় না। তাই দেখা গেল বুড়ো লোকটা বস্ত্রহীন অবস্থায়ই তার স্ত্রীর কম্বলের ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ট্রেন চলছে। সম্ভবত আমার নিচের সিটের লোকটি না ঘুমিয়ে আবছা অন্ধকারে রোমান্টিক দৃশ্যটি উপভোগ করছেন। আমার তো তখন অবস্থা চরম উত্তেজনায়।

বুড়ো লোকটি একটু পরেই বাথরুমে অর্থাৎ টয়লেটে চলে গেলেন। যে অবস্থায় তিনি চলে গেলেন, মনে হলো তার ফিরতে দেরি হবে। পরক্ষণে আমার নিচের লোকটি সেই অজানা, অচেনা পাশের মেয়েটির কম্বলের নিচে চলে গেলেন ও মেয়েটিকে কাজে লাগাতে লাগলেন। মেয়েটি কিছুই বলছে না। বোবা মেয়ের মতো চুপচাপ চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে।

উপরে পালোয়ান লোকটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ পনেরো মিনিট পর নিজ সিটে চলে এলেন। তখনো বুড়োটি টয়লেট থেকে ফিরে আসেননি।

আমার সহযাত্রীটি তারপর তার গন্তব্য স্টেশনে নেমে পড়লেন।

আশ্চর্যের বিষয় থেকে বুড়ো লোকটিকে কিছুই বললো না মেয়েটি, বরং হাসিখুশি মনে হচ্ছিল।

খুব ভোরে আমরা পেশোয়ার ক্যান্ট স্টেশনে নেমে বাসায় যাবো। এর আগে নওশের ওয়া স্টেশনে মেয়েটি আর বুড়ো লোকটি নেমে পড়লেন।

আমি তখন পুরো কমপার্টমেন্টে একা।

ট্রেন থেকে নামার আগে বুড়ো লোকটি আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

মেয়েটি হাসি মুখে শুধু বললেন, *পামাখা দাখা*। অর্থাৎ বিদায়।

ট্রেনে জার্নি করলেই সেই ঘটনাটি এখনো মনে পড়ে। সময়ের ব্যবধানে সেই উত্তেজনা আর অনুভব করি না। কারণ যৌবন বেশিদিন থাকে না।

*ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে*

# কালকা মেলের কথকতা

**- নাহার সিদ্দিকী**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট নাগপুরে ট্রেনে যাবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন *গাড়ির ঝাকানিতে নাড়া পাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায়, ঘুমে স্বপ্নে জাগরণে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। নিশিথীনের মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রান্ত শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতর সৃষ্টি ছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত ধরিয়ে নৃত্য করিতে থাকে।*

ট্রেনে রাত যাপন করতে গিয়ে আমাদেরও এমনি অভিজ্ঞতা হলেও একান্ত প্রয়োজনে ট্রেনে আমাদের চড়তে হয় একবার কেন, বারবার। সিংগাপুর ও ম্যানিলাতে কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজে চাকরিরত অবস্থায় নানান দেশের লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ইনডিয়াতেও সে রকম কয়েকজন আছেন।

আমরা দুজন ছুটে যাচ্ছি সেখানে। দেশ দেখা হয়ে আবার বন্ধুত্বেরও নবায়ন হবে। প্রাণের আবেগে যখন বাধ ভেঙে বন্যা ছোটে তখন তো ভেসে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। কয়েকদিন আগেই দিল্লি থেকে ইমেল পেয়েছি ড. সিকে বাসুর বৌদি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাছাড়া এলাহাবাদ ইনডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজির কনসালটেন্ট প্রফেসর রাধাকৃষ্ণের আহ্বান ছিল তাদের সঙ্গে

ঘুরে বেড়ানোর। আরো আছেন NITTTR–এ কর্মরত শ্যামল মজুমদার, এক্স প্রিন্সিপাল ড. অমিতাভ মুস্তাফী, অজয় রায় চৌধুরী এবং অসীম হাজরা।

আকাশ পথে কলকাতায় পৌঁছে কলকাতার সল্ট লেক সিটিতে উঠলাম NITTTR–এর রেস্ট হাউসে। সবার বাড়িতে বেড়ানো, নিমন্ত্রণ সব সেরে প্রিন্সিপাল মৌলিক বাবুর বাড়িতে আড্ডা জমলো ভালোই। দরকারি এবং অদরকারি আলাপ, প্রলাপ সবই হলো। মৌলিক বৌদির কাছে সবিস্তরে বর্ণনা শুনলাম সুনামির। কারণ তারা তখন আন্দামানের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। সুনামির জলের তোড়ে হোটেলের পানির ট্যাংকের পাশে কুমির চলে এসেছিল শুনে শিহরিত হলাম। কুমির তো সমুদ্রে থাকে না। আশপাশের সব জলাশয় একাকার হয়েই এসব কাণ্ড ঘটেছে।

এবার আমাদের এলাহাবাদ যাবার পালা। আমাদের জানা ছিল এলাহাবাদ কোনো এয়াপোর্ট নেই। পরে অবশ্য জেনেছি এয়ারপোর্ট আছে এবং সপ্তাহে দুই তিনবার কলকাতা থেকে প্লেন যায়। আমার স্বামী মি. সিদ্দিকীর ইনডিয়ায় কোনো ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত সিকিউরিটি সচেতন। তিনি বহুদিন ধরে নানান রকম বই ঘেটে এবং ইন্টারনেট থেকে ইনডিয়ার ট্রেন ভ্রমণ সম্পর্কে লম্বা সব রকমের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেমন ট্রেনের দুই টিয়ারে হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, এয়ারকন্ডিশন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, মালপত্র চেইন ও তালা দিয়ে আটকানো উচিত, ইত্যাদি।

উচিত অনুচিতের উপদেশমালা আমাদের হৃদয়ে বড় বেশি জায়গা নিয়ে নিল। প্রায় পনেরো বছর আগে আমার ইনডিয়া যাওয়া হচ্ছিল একটা বিশেষ ট্রেনিংয়ে। তখন কলিগদের সঙ্গে *রাজধানী এক্সপ্রেসে* কলকাতা, দিল্লি ঘুরেছি। মনে আছে *ননভেজ, ভেজ* এবং *কন্টিনেন্টাল* খাবারের কথা। বিশেষ করে কলকাতা ছাড়ার প্রাক্কালে রবীন্দ্র সংগীতের সুর বাজিয়েছিল ট্রেন কর্তৃপক্ষ। আজো মনে পড়ে *বাজে করুণ সুরে – দূরে, তব চরণতল চুম্বিত পান্থবীণা – হায় দূরে* সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাতে লেখায় রাজধানী এক্সপ্রেসের রোমান্টিক আবেদনে উৎসাহিত হয়ে সে বছর আমাদের ট্রেন যাত্রাটিতে অংশগ্রহণ করি।

যাহোক, এবার আমাদের *কালকা মেলে* যেতে হবে। কারণ *রাজধানী এক্সপ্রেস* বিকেলে যাত্রা করে রাত আড়াইটাতে এলাহাবাদ পৌঁছায়। আমাদের জন্যেও অসুবিধা, যিনি রিসিভ করবেন তাকেও বিব্রত করা। কালকা মেল পৌঁছাবে সকাল নয়টায়। একেবারে সুন্দর সময়।

কলকাতার ফেয়ারলি হাউসে টুরিস্ট কোটায় ডলারের বিনিময়ে অল্প সময়ের মধ্যে টিকেট পাওয়া যায়। ইনডিয়ানদের জন্য বেশ কিছু দিন আগেই টিকেট কেটে রাখতে হয়। শাদা চামড়ার লোকজন বেশ কিছু ভিড় করেছেন সেখানে। তবে লাইন দিতে হলো না। যিনি টিকেট দিচ্ছেন তার কাছে আমার স্বামীর একটি প্রশ্ন ছিল, প্রথমবারের মতো আপনাদের দেশে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, আমাদের জন্য কি আপনার কোনো পরামর্শ আছে?

উত্তরে যা শুনলাম তা হলো, আমরা যেন বন্ধু ভাবাপন্ন সহযাত্রীর দেয়া কোনো খাবার গলাধঃকরণ না করি।

হাওড়া স্টেশনে নির্বিবাদে পৌঁছালাম। সঙ্গে ছিল রেস্ট হাউসের একজন বেয়ারা। সে আমাদের ট্রেনে উঠিয়ে দিল। চেইন কিনে বাক্স–পেটরায় তালা লগিয়ে নিচের বাক্সের পায়ার সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধনে বেধে দিল। মনের মধ্যে একটু দ্বিধা হলো, এ বন্ধনের ডোর ছিন্ন হবে তো!

আমাদের পাশের সিটে দেখলাম দুজন অবাঙালি ভদ্রলোক বসেছেন। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক দুজনের মাল রাখা, গতিবিধি ইত্যাদিতে মনে হচ্ছিল তারা প্রতিনিয়ত এ ট্রেনের যাত্রী হিসেবে চলাচল করছেন। আলাপে জানা গেল একজনের নাম পিএম গুপ্তা, চার্টার্ড একাউন্টেডেন্ট, কানপুরে নামবেন। এলাহাবাদেরও পরে কানপুর স্টেশন।

আমার স্বামী অত্যন্ত আলাপী। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার মেজাজ তুঙ্গে উঠলো। অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, দেশ, কালের আলোচনায় বেশ বুঝতে পারছিলাম খুব দেশপ্রেমিক তারা। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ইতিবাচক চিন্তা তাদের আলোচনায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এমনকি তার একটি ছেলে পোলিও রোগে আক্রান্ত হলেও মহান স্রষ্টার কাছে তিনি কৃতজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ করে থাকেন।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণার জট ছাড়ালেন মি. সিদ্দিকী। আমরা যে কতো লিবারাল জাতি সেটা বোঝালেন তিনি।

একটু পরে উর্দি পরা এক লোক খাবারের প্যাকেট দিল। আমরা ভেবেছি ট্রেনেরই খাবার। কিন্তু দাম চাইলো এবং আমরা দিলাম।

মি. গুপ্তা জানালেন, কালকা মেলে রাজধানীর মতো খাবার দেয় না।

প্যাকেটের ভেতর মোরগ পোলাও। এতো গুরুপাক খাবার খেতে ইচ্ছে করলো না। একটু পরেই আরেকজন নিয়ে এলো ননভেজ খাবার। সেটাও নিয়ে ভেতরের সবজি ও ডাল, দই, মিষ্টি কোনোটাতেই হাত দিলাম না। শুধু রুটিগুলো নিয়ে খেতে শুরু করলাম।

গুপ্তা অস্ফুট স্বরে শুনলাম উচ্চারণ করছেন *শুখা রুটি!* তারপরের মুহূর্তেই আমার স্বামীকে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন, আমার কাছে কিছু খাবার আছে যদি দয়া করে আপনারা একটু খেয়ে দেখেন।

এরপরে দেখলাম কলকাতার *গ্র্যান্ড ওবেরয়* হোটেলের নামাংকিত একটি খাবার ভরা প্যাকেট আমাদের দিলেন তারা।

রাস্তাঘাটে সাধারণত পরিমাণে একটু কম খাই। তাছাড়া ফেয়ারলি হাউসের সে ভদ্রলোকের সাবধানি বানী। কিন্তু সিদ্দিকীর দেখলাম কিছুই মনে নেই। একটা কাবাব রোল খেয়ে ফেললেন তিনি।

চেষ্টা করলাম আমার স্বামীর চোখে চোখ রাখতে কিন্তু কোনো ইঙ্গিতেই পৌছাতে পারলাম না।

উপরের বাংকে সিদ্দিকী শুয়ে পড়লেন, অতিরিক্ত গরম কাপড় চোপড় পরিধান করে এবং ক্রমেই সেগুলো একে একে খুলে ফেললেন। কারণ টু টিয়ার বগিতে মোটেও তেমন অতিরিক্ত শীত বোধ হচ্ছিল না।

একটু বেশি রাতে তিনি গলার স্বর নামিয়ে আমাকে বাংলায় বললেন, সহযাত্রীর দেয়া খাবার তো খেয়ে ফেলেছি। তাই চিমটি কেটে দেখছি এখনো সজ্ঞানে আছি কি না। তুমিও ঠিক আছো তো?

হাসি চেপে রাখতে পারিনি। জানি না গভীর রাতে এই হাসি অন্য যাত্রীদের ঘুম ভাঙিয়ে ছিল কি না!

সকালে আমাদের গন্তব্যস্থান পৌছানোর এক ঘণ্টা আগেই জিনিসপত্র গোছগাছ করে ফেললাম। তারপর দেখি সুটকেস চেইনের বন্ধন খুলতে রাজি নয়। এ বন্ধনের গ্রন্থি না খুললে আমাদের তো মহা সর্বনাশ। এলাহাবাদে ট্রেন দশ মিনিট থামবে।

গুপ্তা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তালা চেইন খুললেন।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এলাহাবাদ নেমে প্রথম কাজ হবে চেইন ও তালাটিকে বিসর্জন দেয়া। তাছাড়া আমাদের একটি সুটকেস ছিল বেশ বড়। ভাবছিলাম ট্রেনে কুলি উঠে না এলে এটা নামানোই মুশকিল হয়ে যাবে। কারণ আরো দুটো লাগেজ আমাদের রয়েছে।

এলাহাবাদ স্টেশনে ট্রেন থামতেই গুপ্তা আমাদের বড় সুটকেসটি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিলেন।

দেখি দাড়িয়ে অপেক্ষারত সহজ সরল জীবনে বিশ্বাসী, জ্ঞানী অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ। পেছনে ফিরে গুপ্তাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালাম।

গুপ্তা সহাস্য বদনে, সবিনয়ে চমৎকার নমনীয় ভঙ্গিতে দুই হাত জোড় করে একটা নমস্কার করলেন।

এক মুহূর্তের সে ভঙ্গিটি যেন মুছে নিল সকল অবিশ্বাস এবং দ্বিধা–ভয়। স্থান, কাল, পাত্র মুছে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল এক পরম আত্মীয় যেন বিদায় দিচ্ছেন আমাদের। সে বিদায়ে আছে নম্রতা, ভদ্রতা আর শিষ্টাচার এবং সব ছাপিয়ে মানুষের প্রতি চিরায়ত মানুষের নিবিড় কল্যাণ কামনা।

*পাইকপাড়া, ঢাকা থেকে*

## অস্বস্তি

**- ফারজানা জামান**

আমি প্রতি বছরে একবার হলেও সিলেটে যাই। কারণ সিলেটের চা বাগানে আমার খালা, খালু থাকেন।

এবার যখন চা বাগানে যাবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ঠিক সেই সময় আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী বললো, ও যাবে আমার সঙ্গে। ও বাগান দেখেনি কখনো। তাছাড়া ট্রেনও চড়েনি অনেক দিন। তাই আমার সঙ্গে রওনা হলো সিলেটের চা বাগান দেখার জন্য।

যথাসময়ে আমরা সিলেটে পৌছালাম। তবে আন্টির নিজস্ব গাড়িতে গিয়েছিলাম। মাত্র তিন দিন ছিলাম।

আমার বান্ধবী তো চা বাগান দেখে একেবারে মুগ্ধ। যাই দেখে তা–ই তার ভালো লাগে। এভাবে সারা দিন ঘুরে–ফিরে আমাদের সময় যে কখন শেষ হয়ে গেল টেরই পেলাম না। মানে, আমাদের ছুটি নিতে হয়েছিল মাত্র তিন দিনের জন্য।

যাই হোক। আবার সেই নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছে যেতে হবে। কি আর করা! খালা, খালুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম স্টেশনে। দেখি ট্রেন দাড়িয়ে আছে। যার যার ব্যাগ জায়গা মতো রাখলাম।

প্রায় পনেরো মিনিট পর ট্রেন ছাড়লো। বেশ মজা লাগছিল। ট্রেনের জানালার কাছে বসেছিলাম। চারদিকের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় বেশ কেটে যাচ্ছিল।

আমার বান্ধবীও বেশ উপভোগ করছে।

আমাদের বগিতে বেশ কয়েকজন অল্প বয়সের ছেলে উঠেছিল। ওদের কথাবার্তা, আড্ডায় চারপাশ বেশ মুখরিত ছিল। মনে হচ্ছিল এরাও বুঝি প্রথম ভ্রমণ করছে।

হঠাৎ আমার বান্ধবী বললো, ও টয়লেটে যাবে।

আমাদের এক সিট পেছনেই টয়লেটটা ছিল।

কিন্তু সমস্যা হলো, ও কিছুতেই টয়লেটে যেতে চাচ্ছে না। কারণ আমাদের সামনেই সেই তরুণদের দল। টয়লেটে যেতে হলে প্রত্যেকেই ব্যাপারটা দেখতে পাবে। এতে আমার বান্ধবী বেশ লজ্জা পাচ্ছে। ব্যাপারটা সত্যিই লজ্জাজনক।

অনেক সংকোচ আর লজ্জা করেও তাকে শেষ পর্যন্ত যেতে হলো। তাছাড়া টয়লেটের দরজার সামনেই এক বৃদ্ধ লোক দাড়িয়ে ছিলেন। হয়তো সিটে বসার মতো টাকা তার নেই। তাই এভাবে দাড়িয়েই তিনি যাচ্ছিলেন। দেখে খুব খারাপ লাগছিল। একে তো টয়লেট সমস্যা, তার ওপর আবার ঠিক দরজার সামনেই লোকটা দাড়ানো।

আমার বান্ধবী এসে বললো, কেন যে টয়লেটটা এমন জায়গায়!

একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, শুধু যে আমরাই লজ্জা পাচ্ছি তা নয় যেকোনো বয়সের নারীদের মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। কেউ বা তার স্বামীর সঙ্গে, কেউ বা তার বাবার সঙ্গে টয়লেটে যাচ্ছে। ব্যাপারটা সত্যিই খুব বিব্রতকর।

টয়লেটে যাবে, তাও আবার সঙ্গে করে একজনকে নিতে হবে কেন? অথচ ছেলেরা তো নির্বিকারভাবে টয়লেটে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে তো কোনো সংকোচ বোধ কাজ করছে না। অথচ প্রত্যেক নারীরা এই ব্যাপারটায় বেশ লজ্জা পাচ্ছে। সে জন্য মহিলা যাত্রীদের জন্য যদি আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সবাই এই বিব্রতকর কিংবা লজ্জাজনক পরিবেশ থেকে রেহাই পেতো। সকল মহিলা যাত্রীরা এতে বেশ স্বস্তি বোধ করতো।

এই ব্যবস্থা থাকলে হয় তো আর কোনো মহিলা যাত্রীকে এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না। আর সঙ্গে করে বাবা কিংবা স্বামী অথবা ভাইকে নিয়ে টয়লেটের সামনে যেতে হতো না।

*ঠিকানা বিহীন*

# সাহসী

**- এম উদ্দিন আহমেদ**

**এক.**

তখনো ১৯৬৯–এর গণআন্দোলন পূর্ণরূপ নেয়নি। ছাত্র সমাজ এগারো দফা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছেন।

বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতিতে চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিয়েছি। দেশে একটা থমথমে ভাব, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* চলছে। দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ, মানিক মিয়া জেলে। একখানা ডেইলি অবজার্ভার নিলাম। ব্যানার হেডিং ছিল *Witness Kamal Delcarled Hostile.*

সেকেন্ড ক্লাস বগিতে দরজার পাশে বসে দুই বন্ধুতে আলাপ করছিলাম।

আমাদের আলাপে পুরো কম্পার্টমেন্ট বৈরী এবং ছাত্ররা কেন এসব করবে ইত্যাদি প্রশ্নবানে আমাদের কোণঠাসা করছিল।

একজন উদ্দীপ্ত বাঙালি সৈনিক কোণায় বসে আমাদের বিতর্ক শুনছিলেন।

কুমিল্লাতে নেমে যাবার মুহূর্তে বলেছিলেন, You students, why are you demanding 11 points? Demand one point Freedom And we will be with you.

আপনারা ছাত্ররা এগারো দফা কেন চাইছেন? এক দফা চান। স্বাধীনতা। আমরা আপনাদের পাশে থাকবো।

সেই বাঙালি সৈনিকের সাহসী উক্তি আজও মনে পড়ে।

**দুই.**

বড়লেখা থেকে কুলাউড়া আসবো স্থানীয় ট্রেনে। ছায়েকভাই বললেন, ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট নেবে কেন, সেকেন্ড ক্লাসের টিকেটে ফার্স্ট ক্লাসে উঠবো।

বললাম, একটু অধিকার নিয়ে চলবো।

সত্য হলো তার কথা। ছয়জনের স্থলে দিল আটজন বসিয়ে। পরবর্তী স্টেশনে দাড়ানোরও স্থান থাকলো না। এক বৃদ্ধ মহিলাকে দেখে নিজের স্থান ছেড়ে চায়ের টেবিলটা খুলে ওটাতে বসলাম।

ইতিমধ্যে একজন কলেজ পড়ুয়া এলেন। বললেন, আপনি একটু সরলে আমিও বসতে পারি।

বললাম, দুজন বসলে ভেঙে যাবে এবং আপনার কি ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট আছে? আপনি তো ছাত্র, কলেজ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন। এবং ফার্স্ট ক্লাসে কেন, সেকেন্ড অথবা থার্ড ক্লাসে যান। বিনা টিকেটেই যখন যাবেন। এখানে তো লোকজন একটু বেশি পয়সা খরচ করে ওঠে যাতে একটু সুযোগ সুবিধাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সেই ছাত্রসহ সহযাত্রীরা সবাই নীরব।
পরবর্তী স্টেশনে অনেকেই নেমে গেল।
এক বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন যখন কথাগুলো বলছিলাম। বৃদ্ধের এই দোয়াটা আজো আমার সম্বল, বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার মতো সাহস নিয়ে এসব ছেলেপেলেদের সামনে যদি আরো কিছু লোক কথা বলতে পারতো! আসলে আমাদের সাহসের দরকার।

**তিন.**
অনেক দিন দেশে যাওয়া হয় না। মাকে দেখতে কুলাউড়া গেলাম। নিজের শৈশব কেটেছে। পরিচয় পরিধি মোটামুটি। এখনো অনেকেই বিভিন্নভাবে জড়িত আছেন স্থানীয় বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মে।
*পারাবত*–এ ঢাকা ফেরার টিকেট। ট্রেন দুই মিনিটের বিরতি। সবাইকে যার যার জায়গা নিতে হবে।
একদিকের দরজা দিয়ে উঠলেন লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি আট দশজনের মধ্য বয়স্ক কয়েকজন। অন্যদিকে দরজা দিয়ে পেছনে আমিসহ দুই তিনজন এবং তার আগে ছয় সাতজন ভদ্রমহিলা।
সামনের পাগড়ি পরিহিতরা রাস্তা না ছাড়লে মহিলারা নিজেদের স্থান নিতে অক্ষম। অথচ পাগড়িওয়ালারা রাস্তা দিতে নিজেদের সংকুচিত করছিল না। একটু সরতেও ছিল অনিচ্ছা।
আপত্তি জানালাম সাহস করে।
ওদের মধ্যে একজন রাশভারি স্বরে বললেন, কথা বলিও না।
উত্তর দিলাম, অন্যায় বলবো না। মনে হচ্ছে আপনারা কোনো ধর্মকর্মে যাচ্ছেন। তা এই মহিলাদের রাস্তা করে না দেয়া কি ধর্ম–কর্মের অংশ?
সবাই সরে গেলেন। এবং আমরা যার যার জায়গাতে বসলাম।
অ্যাটেনডেন্ট–কে বললাম, আপনারা এসব দেখেন না?
বললো, কে শুনবে সাহেব?
বললাম, আমার টিকেট থেকে তোমার বেতন হয় এসব সুযোগ সুবিধা করার জন্যই।
ঢাকা পর্যন্ত এলাম, আমার আশপাশে সবার টিকেট দেখলেও আমার টিকেট দেখতে কেউ আসেনি।

*আবু ধাবি থেকে*

# দুটি অনুরোধ

**- মোরশেদ**

মানুষের যেকোনো ভ্রমণ হয় আনন্দের, না হয় তিক্ততার। কিন্তু আমার এ ট্রেন ভ্রমণটি তিক্ততা ও আনন্দের সংমিশ্রণের। তিক্ততা ও আনন্দের সংমিশ্রণ বলছি এই জন্য যে, আমার এ ভ্রমণটির প্রথম দিকে এতো তিক্ত লাগছিল যে মনে হচ্ছিল চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিই। কিন্তু শেষে এসে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা আজো আমাকে শিহরিত করে।
২০০৩ সালের কথা। আমি আর আমার এক বন্ধু রাজশাহী গিয়েছিলাম একটা কাজে। যদিও কাজটি একদিনে হওয়ার কথা তবুও আমার কাজটি হয়েছিল তিন দিনে অনেক ঝামেলার পর।
তিন দিন পর বাড়ি ফিরছি, হাতে টাকাও প্রায় শেষ। তাই টিকেট না কেটেই *বরেন্দ্র এক্সপ্রেস* ট্রেনে উঠে পড়লাম। পরিচিত এক অ্যাটেনডেন্টের কাছে গিয়ে বললাম, আংকল, টাকা কম হওয়ায় টিকেট কাটা হয়নি।
তিনি বললেন, ঠিক আছে, দুজন আছো, একজনের টাকা দাও।

তাই দিলাম। টাকা নিয়ে তিনি আমাদেরকে চারজন বসার মতো একটা সিট দেখিয়ে বললেন, এখানে বসো। দেখলাম একজন বসে আছে। আমরা দুজনও গিয়ে বসলাম।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর আরো দুটো ছেলে এসে বললো, এই ভাই, উঠতে হবে এখান থেকে।

কেন উঠতে হবে ভাই?

এটা আমাদের জায়গা, তাই।

বললাম, প্লিজ ভাই, চারজনের সিট আর সমস্ত কম্পার্টমেন্টে কোনো জায়গা নেই। সবাই বন্ধুর মতো একটু কষ্ট করে বসি ভাই, প্লিজ।

অতো কথা নেই, উঠবি কি না বল?

তার কথা শুনে আমি অবাক! শুধু আমিই নই, পাশের সিটের দুটো মেয়েসহ সমস্ত যাত্রীরা হা করে আমাদের দেখছে। মনে হয় যেন আমরা দুজন চোর। এবং আমি বিএসসি কমপ্লিট করলেও চেহারায় মনে হয় যেন এইচএসসি পাসই করিনি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা আমাদের নিশ্চিত দুই–তিন ইয়ারের জুনিয়র। তাই আমিও কমে ছেড়ে দেবো না। কারণ আমার বাড়ি আবদুলপুর। ট্রেনটি আমার বুকের ওপর দিয়েই যাবে।

রেগে বললাম, উঠতে পারবো না, ইচ্ছা হলে বসুন, নতুবা অন্যত্র যান।

ছেলেটি আরো রেগে গেল।

না উঠলে ঘাড় ধরে তুলে দেবো। এটা আমাদের সিট। আমাদের টিকেট আছে।

কিন্তু আমাদের কাছে টিকেট নেই। তাই অনেকটা বাধ্য ও অপমানিত হয়েই যখন উঠে আসছিলাম, দেখলাম পাশের সিটের সুন্দরী তরুণী দুটি হাসছে। অপমানটি বুকে বিধে গেল। শুধু বললাম, খুব খারাপ ব্যবহার করলেন, এটা উচিত নয়। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতোক্ষণে দাত ফেলে দিতো।

উত্তরে যা শুনলাম তা বলার মতো না।

যা পারলে (...) ছিড়ে নিস।

ঠিক আছে, একটু পরই বুঝবি মজা। হয় তো বন্ধুর সাপোর্ট পেলে ওখানেই মেরে তার দাত ফেলে দিতাম। কিন্তু বন্ধু আমার শুধু উভয় পক্ষকে থামানোতেই ব্যস্ত। যদিও সে আমার চেয়েও চটা তবুও সেদিন সে যেন মুরুব্বি হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে ওই অ্যাটেনডেন্টও এসে গেছেন। ব্যাপারটি বুঝেই তিনি আমাদের অন্য কম্পার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে একটা সিটে বসিয়ে দিলেন। ক্ষোভে, রাগে, টেনশনে আমি একের পর এক সিগারেট টানছি।

অ্যাটেনডেন্ট আংকল আবার দুটি বেনসন নিয়ে এসে বললেন, বাপ, তুমি শান্ত হও। ওরা জুনিয়র, বেয়াদব ছেলে, ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন দিতে এসেছিল। বাড়ি সম্ভবত শান্তাহার। তুমি মাথা গরম করো না। ধরো বিড়ি খাও। দেখো তোমাদের লিডার কতো শান্ত মানুষ ছিলেন, তোমরা তার আদর্শের সৈনিক হয়ে এতো গরম হলে চলে?

আংকল, ওই বেয়াদব যে আচরণ করেছে, আজ তার রক্ষা নেই যদি সে আমার কাছে ক্ষমা না চায়।

ঠিক আছে, তুমি শান্ত হয়ে বসো, দেখি কি করা যায়। বলে তিনি চলে গেলেন।

রাজশাহীতে কাজ হতে বিলম্ব হওয়া এবং এই ঘটনায় শান্তি পাচ্ছি না। এমন সময় ট্রেনও আবদুলপুর স্টেশনে ঢুকলো। ট্রেন থেকে নেমেই বই বিক্রি করা তিনজন হকার টোকাইকে পাঠালাম, যা আমার কথা বলে ওদের নামিয়ে নিয়ে আয়।

আবদুলপুরের ছেলেদের যে ক্ষমতা, ইচ্ছা করলেই তারা অনেক কিছু করতে পারে। ইচ্ছা ছিল এই পরিবেশ বুঝিয়ে ওদের চা-সিগারেট খাইয়ে বন্ধুর মতো বিদায় দেবো। কিন্তু তা আর হলো না। যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের ডাকতে তারা অপমানিত হয়ে ফিরে এলো।

মাথার আবার রক্ত চড়ে গেল। গেলাম নিজেই ওই বন্ধুকে নিয়ে। দেখলাম ওরা আরো দুজনকে জুটিয়ে লুঙ্গি বিছিয়ে তাশ খেলছে। বললাম, এই ছেলে, ভালো চাও তো নেমে এসো। আজ তোমার বাপও এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না তোমায়।

কিন্তু সে নামবে না, বরং উল্টা-পাল্টা কথা বলছে।

টেনে নামানোর জন্য তার জামার কলার ধরতেই ফাউ দুজন দৌড়ে পালিয়ে গেল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। আমরা নামাবোই। কিন্তু সে নামবে না।

আমার বেল্ট খুলে হাতের জোরে বেল্টের বাকলস দিয়ে ভালোই উত্তম মধ্যম দিলাম।

অবশেষে ওই মেয়ে দুটির অনুরোধে তাদের ছেড়ে দিয়ে নেমে আসছি তখন জিআরপি এসে আমাকে ধরলো। আমার ওই বন্ধু থানা ছাত্রলীগ সেক্রেটারি রফিকভাইকে ফোন করতেই ভাই এসে আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন। ট্রেনও চলে গেল।

বাড়ি যাওয়ার জন্য প্ল্যাটফর্ম পার হচ্ছি। হঠাৎ একটি মেয়ের ডাকে পেছনে ফিরলাম। দেখি ওই সুন্দরী মেয়ে দুটি আমাকে ডাকছে।

থ্যাংকস ভাই, আজ আপনি না থাকলে আমাদের কি যে হতো আল্লাহই জানে।

কেন? আপনাদের আবার কি হলো? যখন আমরা সিট থেকে উঠে আসি তখন তো খুব হাসছিলেন।

সরি ভাই, আসলে আমরা তখন সিচুয়েশন বুঝতে পারিনি। আমাদের বাড়ি ফুলবাড়ি। আপনারা উঠে যাওয়ার পর ওরা সে দুজনকে নিয়ে তাশ খেলছিল তারা আমাদের রাজশাহী থেকে ডিসটার্ব করছিল। বন্ধুত্ব করার প্রস্তাব দিচ্ছিল এবং বন্ধুত্ব না করলে ওরা আমাদের শান্তাহার নামিয়ে রাখবে বলে হুমকিও দিয়েছিল।

কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিলেন, এখন যাবেন কিভাবে?

বাড়ি যাবো না। *তিতুমীর এক্সপ্রেস*-এ রাজশাহীতে ফিরে যাবো। আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। পরে বাড়িতে ফোন করে দেবো, ভাইয়া এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।

কিন্তু তিতুমীর তো সেই রাতে। এতোক্ষণ কোথায় থাকবেন? তারচেয়ে চলুন আমার বাড়ি, এই তো পাশেই। ফ্রেশ হয়ে খাওয়া-দাওয়া করতেই টেনের সময় হয়ে যাবে।

নো থ্যাংকস। তার চেয়ে আপনি থাকলে স্টেশনেরই কোথাও বসা যাক।

আপনাদের ইচ্ছা, কিন্তু লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে। নিশ্চয় কিছু খাওয়া হয়নি। চলুন পাশের হোটেলে বসি।

ওকে, চলুন।

তাদের ব্যাগটি হাবিব-ভাইয়ের দোকানে রেখে তাদের নিয়ে ঢুকলাম হোটেলে। হোটেল থেকে খাওয়া-দাওয়া করে ওভার বৃজের সিড়িতে বসলাম।

তাদের নাম জানলাম, একজনের নাম পারু, অন্যজনের নাম ইয়াসমিন।

কথা বলছিলাম আর ধূমপান করছিলাম। অনেক গল্প হলো। হঠাৎ পারুর অপূর্ব চোখের ক্যারিসমা আমার নজরে পড়লো।

এই পারু, আপনার চোখ দুটি খুব সুন্দর।

থ্যাংক ইউ।

দেখলাম পারু লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো।

বললাম, বিধাতা মানুষকে যে সৌন্দর্য দান করে তা অপার। তাকে আড়াল করতে নেই।

সে শুধু একটু হাসলো।

আরো অনেক কথা হলো। এক সময় তিতুমীর ট্রেনের সময় হলো। ট্রেনও এলো, তাদের সিটে বসিয়ে বিদায় নিচ্ছি! হঠাৎ পারু আমার জামার পেছনের অংশ ধরে টেনে সামনের সিটে বসিয়ে বললো প্লিজ, ছোট্ট দুটি রিকোয়েস্ট করি, রাখলে খুব খুশি হবো। রাখবেন কি না বলুন?

বলুন, রাখার মতো হলে চেষ্টা করবো।

আজ থেকে আর ধূমপান করবেন না, প্লিজ! এবং কখনো বাইরে গিয়ে কারো সঙ্গে বিবাদ করবেন না, কথা দিন।

বললাম, চেষ্টা করবো, ভালো থাকবেন।

পারুর প্রথম রিকোয়েস্ট আজো রাখতে পারিনি।

কিন্তু দ্বিতীয় রিকোয়েস্ট রাখতে আজো চেষ্টা করি। যদিও পারু হলেরসহ বাসার ঠিকানা দিয়েছিল তবুও যাইনি আজো। তবে ট্রেনে উঠলে বা একাকীত্বে ওই ট্রেন ভ্রমণের কথা মনে হলেই পারুর ওই সুন্দর চোখ দুটি ভেসে ওঠে এবং তার অনুরোধ দুটি মনে পড়ে।

জানি না আজো পারু নামের সে সুনয়না আমাকে মনে রেখেছে কি না...।

*আব্দুলপুর, নাটোর থেকে*

# দু ঘণ্টায় বাইশ মাইল

**- মাহতাব উদ্দিন**

ধান–নদী–খালের জন্য বিখ্যাত বরিশাল। আর নদী–খাল বেশি থাকার কারণেই বরিশাল জেলায় রেললাইন নেই। সে জন্যই শৈশবে ট্রেন দেখার ভাগ্য হয়নি।

বিভূতিভূষণ তার বইয়ে অপু ও দুর্গাকে ট্রেন দেখিয়েছিলেন অনেকখানি হাটিয়ে। আমি হাটা দূরত্বে ট্রেন দেখতে পারিনি। তখন বইয়ের সেই প্রশ্নটি মনে পড়তো, কোন জেলায় রেললাইন নেই? উত্তর, বরিশাল।

আমাদের ছোটবেলায় মানুষ গ্রাম কেন্দ্রিক ছিল। এখন মানুষ শহর কেন্দ্রিক। ছোট শিশুদেরও দূর শহরে যাবার সুযোগ হয় প্রায়ই। তখন বয়স্ক লোকের মুখেও শুনেছি তারা অনেকেই নিজের জেলা শহরে যাননি। ফ্যাকাশে মুখে বলতেন, *আইতে শাল যাইতে শাল তার নাম বরিশাল*।

তাই আমিও ভাবিনি, খুব শিগগিরই ট্রেন দেখতে পাবো। একদিন সে সুযোগ এলো।

ট্রেন সম্পর্কে অনেকের মুখে অনেক আজগুবি গল্প শুনেছি। যেমন ট্রেন এতো দ্রুত চলে যে, দুই পাশের গাছগুলো শুয়ে পড়ে। ট্রেন চলা শুরু করলে মাটিতে থাকে না, হাওয়ায় উড়ে যায়। আরো কতো কি!

ভানু বন্দোপাধ্যায়ের একটা কৌতুক এ রকম – ভানুর কলকাতার বন্ধু বলছে, সেখানকার ট্রেন এতো দ্রুত চলে যে, পাশের লাইট পোস্টগুলোকে চিরুনির দাতের মতো ঘন মনে হয়।

ভানুও হারার পাত্র নয়। সে বললো, ঢাকার বৃটিশ ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে প্ল্যাটফর্মে দাড়ানো তার স্ত্রীকে বিদায় চুমু দেয়ার জন্য মুখ বাড়ালেন। কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিল আর সে চুমু গিয়ে পড়লো নারায়ণগঞ্জ রেল স্টেশনে তাকে রিসিভ করতে আসা তার খাস খানসামা ঈসমাইলের গালে। বুঝুন ঠ্যালা। এতো ট্রেন নয়, যেন ট্রান্সপ্লান্ট।

অবশেষে একদিন খুলনা যাবার সুযোগ এলো। স্টিমারে না গিয়ে বরিশাল থেকে লঞ্চে হুলারহাট, সেখান থেকে সড়ক পথে পিরোজপুর হয়ে বাগেরহাট। বাগেরহাট থেকে ট্রেনে রূপসা যাওয়া যায়। নদী পার হলেই খুলনা শহর।

অতএব ট্রেনে যাবার সিদ্ধান্তই হলো। *রথ দেখা কলা বেচা এক সঙ্গে*। তাছাড়া স্কুলে বন্ধুদের কাছে গল্প করা যাবে। তারা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে। ইজ্জত বেড়ে যাবে।

*নয়টার ট্রেন কয়টায় ছাড়বে* কথাটা জানাই ছিল। কাকতালীয়ভাবে সেই ট্রেন ছাড়ার সময়ও ছিল নয়টায়। কিন্তু রাত নয়টা অতিক্রান্ত হলেও ট্রেন এসে পৌছালো না। এবার অপেক্ষার পালা। স্টেশনে দাড়িয়ে, বসে আর সময় কাটে না। সময়ক্ষেপণের জন্য আশপাশে ঘুরে দেখছি।

এক মহিলাকে বলতে শুনলাম, *আজ আর যাতি পারবোনানি। চল বাড়ি চইলে যাই। এই রিকশা, পুলেরহাট যাবা।*

রিকাশাচালক বললো, *যাবো। কিন্তু পাচ টাকা দিতে হবিনে।*

মহিলা চেচিয়ে বললো, *ও মামা, বলে কি, শুনিছো। পাচ টাকা চাতিছে। চড়াতি ইচ্ছা করে না! বলি মগের মুল্লুক পাইয়েছো?*

এসব শুনতে শুনতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। এ সময় দূরে আলো ও হুইসল শোনা গেল।

মহিলা বললো, *ওই আলেন মনে হতিছে। ঠিক আছে, খুললেই চলি যাই। পাচ টাকা পুরো লাগবিনানে।*

আমি তখন সেই মহামহিম রাজার হাতিকে দুই চোখ ভরে দেখতে ব্যাকুল। লোকজন নামছে, চলে যাচ্ছে। অতঃপর টিকেট কেটে ট্রেনে উঠছিলেন।

পেছন থেকে মহিলা বললো, *ধরো দিকিনি আমার হাতখানা। শক্ত কইরে ধরো। তোমার যা টিংটিংয়ে চেহারা আবার না উল্টে পড়ে যাও।*

হুড়োহুড়ি করে লোকজন উঠছে। কোনো মতে একটু জায়গা পেয়ে বসে পড়লাম। ইঞ্জিন ঘুরে এসে আবার জোড়া লাগলো ঘটাং করে। ইঞ্জিনের শব্দটা মনে হলো যেন হাপানি রোগীর শ্বাসকষ্টের কাতরানি। চলাও সেই হাপানি রোগীর মতো থেমে থেমে। ছারপোকা কুটুস করে কামড় দিয়ে যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে। হায়রে অসহনীয় অবস্থা! ইচ্ছা হয় নেমে হেটে চলে যাই।

ট্রেন এতো ধীর গতিতে চলে যে, অনেক লোক বাড়ির কাছে এসে বোচকা–বুচকি ফেলে দিয়ে লাফ মেরে নেমে চলে যায়। এভাবে নামতে নামতে যাত্রীর সংখ্যা অনেক কমে গেল। এক সময় ট্রেনও থেমে গেল।

ক্ষীণ একটা আলোর রেখা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করলো। কেরোসিনের বাতি হাতে একটি ছোট মেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে ট্রেনের দিকেই আসছে। বাড়িটা নারিকেল, সুপারি, আম, কাঠাল গাছে মোড়ানো। মেয়েটা গাড়ির কাছাকাছি আসতেই প্রৌঢ় এক লোক জানালা দিয়ে ঝুড়ি, বস্তা ফেলে দিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, *মিনু আমি এখানে। দাড়া নামতেছি।*

মেয়েটি হেসে বললো, *বাবা, তুমি আসিছো। মা বলতেছিল, আজ আর আসবিনানি।*

মেয়েকে পিতা বুকে জড়িয়ে ধরে আলো নিয়ে চলে গেল।

আবার চারদিক ঘুরঘুটে অন্ধকার। জানালা দিয়ে তাকালে মনে হয় চোখের পর্দার সঙ্গে কালো দেয়ালের ধাক্কা লাগছে। ট্রেন চলার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। রাত কতো বুঝতে পারছি না। তখন ঘড়ি এতো শস্তা ছিল না।

চুপ করে মহাকালের অতল অন্ধকারে মহাযাত্রার অপেক্ষায় বসে থাকলাম।

বিরক্তিতে সম্ভবত ঘুম পায় অথবা ক্লান্তিতে। আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। পুনরায় ট্রেন চলতে শুরু করলে জেগে গেলাম। এবং রাত সাড়ে বারোটায় রূপসা নদীর তীরে পৌছালাম।

প্রথম ট্রেন ভ্রমণ আমাকে দারুণভাবে হতাশ করেছিল নিঃসন্দেহে। মাত্র বাইশ মাইল পথ যেতে সময় নিল দুঘণ্টা। সাইকেল থাকলে বহু আগেই চলে যাওয়া যেতো।

নোংরা, দুর্গন্ধময় এক পরিবেশ ছিল ট্রেনের বগিতে। ল্যাট্রিনের উৎকট গন্ধ। পুরো কম্পার্টমেন্টে ছড়ানো ছিল আখের ছোবড়া, বাদামের খোসা ইত্যাদি নানান আবর্জনা। তাছাড়া মুহূর্তে ছারপোকার কামড় জীবনটাকে একেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা করে ছেড়েছিল।

আমার সঙ্গী বড় ভাই বাসে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন।

আমি শুনিনি।

তিনি বললেন, আর যাবি ট্রেনে?

বললাম, দরকার হলে হেটে যাবো, তবুও ট্রেনে আর নয়।

তবে সে কথা টেকেনি। ইউনিভার্সিটি জীবনে খুলনা থেকে রাজশাহী বহুবার ট্রেনে যেতে হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা–চট্টগ্রাম, চাদপুর–চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকা–সিলেট বহুবার ট্রেনে গিয়েছি। তবে সেসব অভিজ্ঞতা ট্রেন টু রূপসা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

*চরফ্যাশন কলেজ, ভোলা থেকে*

# টিটি, জিহারু ও জাপান

**- মোহাম্মদ শফিউর রহমান**

দেশে ট্রেনে চড়তে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা ভেবেই দুশ্চিন্তায় পড়লাম ইচিগা ইউজাওয়া থেকে কানাজাওয়া যাওয়ার পথে। শিনজুকুর হোটেল সানরুট টোকিওতে *এশিয়ান প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন* আয়োজিত এনার্জি কনজারভেশন কোর্সে অংশ নিতে ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে জাপান যাই।

কোর্স শেষে কানাজাওয়ার ইশিকাওয়াস্থ টাটসুনোকুচিতে ভায়রা রাজ ও শ্যালিকা শীলার বাসায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল। এ জন্য দেশ থেকে খাদ্য–খাবারের ত্রিশ কেজি ওজনের বিশাল ভাণ্ডার আমার ঘাড়ে চাপে।

কোর্স কোঅর্ডিনেটর টোকিও থেকে বিকেল পৌনে পাচটার ট্রেনের টিকেট কিনে দিয়েছিলেন। কানাজাওয়া পর্যন্ত সরাসরি শিনকানসেন না থাকায় টোকিও–নাগাওকা শিনকানসেন এবং নাগাওকা–কানাজাওয়া মেল ট্রেন ধরতে হবে।

শিনজুকু থেকে জেআর ধরে টোকিওর উদ্দেশ্যে রওনা হই। স্টেশনসহ সর্বত্র সাইনবোর্ডগুলো জাপানিজ ভাষায় হওয়ায় সমস্যা হলো কোনটি টোকিও স্টেশন তা নিয়ে। লোকজন ইংরেজি বোঝে না।

রক্ষা পেলাম এক ইওরোপিয়ান মহিলার কারণে। তিনি জানালেন এটাই টোকিও স্টেশন।

ইংরেজি জানা একজনকে পেয়ে হাতছাড়া করলাম না। অনুরোধ করলাম শিনকানসেন কোথায় থেকে ধরবো তা জানানোর জন্য। তখন বেলা প্রায় আড়াইটা।

তিনি টিকেট দেখে ট্রেনের টাইমটেবিলের সঙ্গে মিলিয়ে বললেন যে, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার যাত্রা তিনটা বারো মিনিটের ট্রেনে এগিয়ে নিতে পারো।

বললাম, তথাস্তু। তবে টিকেট চেঞ্জের দায়িত্বটা তুমিই নাও।

কাউন্টারে পনেরো মিনিট দরকষাকষি করে টিকেট বদলে দিলেন এবং দিলেন কিছু ইয়েন। কারণ এ ট্রেনে নাগাওকার আগেই ইচিগা ইউজাওয়াতে বদল করে মেল ট্রেন ধরতে হবে। ফলে বিমান ভাড়ার মতো ব্যয়বহুল শিনকানসেন ট্রেনে কম রাস্তা পাড়ি দেয়ায় টাকা ফেরত পাওয়া গেল।

তবে একটা সমস্যা থেকে গেল। মেল ট্রেনটায় নন স্মোকিং সিট পাওয়া গেল না। তিনটা টিকেট আমার হাতে এলো। কিন্তু জাপানিজ ভাষায় হওয়ায় কোনটা কি বুঝলাম না।

টিকেটগুলো পেয়ে মহিলাকে *আরিগাতো* (ধন্যবাদ) জানালাম।

তিনি আমাকে ভেতরে ঢোকার গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

তার পরামর্শ মতো টিকেট তিনটা মেশিনে ঢোকালাম এবং দুইটা ফেরত আসায় তা নিয়ে ট্রেনের খোজে ছুটলাম। *বুলেট ট্রেন*–টা উপরের লেভেলে হওয়ায় দেশি মালামালের সঙ্গে যোগ হওয়া আমার কিছু জিনিসসহ চল্লিশ কেজি নিয়ে টেনে হিচড়ে চল্লিশ ধাপ সিড়ি টপকে বুলেট ট্রেনের দেখা পেলাম। ট্রেনে সিট খুজে পেয়ে আপাতত স্বস্তি বোধ করলাম।

ট্রেন তিনটা বারো মিনিটেই ছাড়লো। স্বপ্নের বুলেট ট্রেনকে ভিন্ন কিছু মনে হলো না।

এক সময়ে টিটি এলো এবং অন্যান্যের সঙ্গে আমার টিকেট দেখে পরীক্ষা করে চলে গেল।

ট্রেন যথাসময়ে ইচিগা ইউজাওয়া পৌছালো।

ট্রেন থেকে বেশির ভাগ লোক যেদিকে যাচ্ছিল তাদেরকে ফলো করলাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমার একজন সিনিয়র শুভাকাঙ্ক্ষী এই বুদ্ধি আমাকে দিয়েছিলেন আমার প্রথম বিদেশ যাত্রাকালে যা আজো ফলো করছি এবং অন্যদেরকে সে উপদেশ দিয়ে চলেছি।

যাহোক, শিনকানসেন থেকে মেল ট্রেন ধরার জন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার পথে টিকেট চেকার পথ আটকালো এই বলে যে, টিকেট ঠিক নেই।

জাপানিজ ভাষায় তাদের কথা কিছু না বুঝেও ইংরেজিতে চেষ্টা করে বুঝিয়ে কোনোক্রমে রেহাই পাই।

মেল ট্রেনে ঢুকে মনে হলো আগ্নেয়গিরিতে (স্মোকিং বগি হওয়ায়) ঢুকলাম।

নিজের সিট খুজে বসলাম। পাশে বিশ একুশ বছরের জাপানিজ একটা মেয়ে বসে সিগারেট ফুকছে আর বই পড়ছে। তবে গলায় কোনো মোবাইল ঝোলানো নেই যা প্রায় সব জাপানিজের গলায় ঝোলে।

এক সময় টিটি এলো। আমার ভাণ্ডারে রক্ষিত সব টিকেট তাকে উজাড় করে দিয়েও কেন যেন তাকে খুশি করতে পারলাম না।

ভয় হলো কানাজাওয়া যাওয়ার বদলে আমার ভাগ্যে বুঝি হাজতবাস ঘটবে যেমনটি দেশে মোবাইল কোর্টের হাতে পড়ে অনেককে হতে দেখেছি। তবে বিধাতা সদয় ছিল বলেই মেয়েটি (জিহারু) বই থেকে মুখ তুলে টিটি–কে বোঝানোর জন্য আমার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো।

নতুন জেনারেশনের মেয়েটি ইংরেজি বোঝায় আমার সমস্যা সে বুঝলো এবং টিটি–কে তা ব্যাখ্যা করলো বলে মনে হলো।

টিটি আপাতত ক্ষান্ত দিয়ে চলে গেল।

জিহারু–র সঙ্গে কিছুটা খাতির হয়ে গেল। জানলাম সে সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়িতে (ইচিগা ইউজাওয়ার আগের একটা স্টেশনে) যাচ্ছে। টোকিওতে চাকরি করে।

এক পর্যায়ে সে ব্যাগ খুলে তার মোবাইল বের করে কারো সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললো।

আমার মাথায় তখন চিন্তা এলো যে, আমি রওনা হওয়ার আগে রাজকে জানিয়েছিলাম পৌনে পাচটার ট্রেনের কথা এবং রাজ সে অনুযায়ী স্টেশনে আসবে। আমার আগে রওনা হওয়ায় কানাজাওয়াতে দেড় ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। রাজকে একটা টেলিফোন করা গেলে সে সময় মতো স্টেশনে আসতে পারতো।

জিহারু–কে বললাম, একটা টেলিফোন করতে চাই।

সে সানন্দে রাজি হয়ে মোবাইল সেটটা দিল।

রাজকে সব ঘটনা জানালাম।

এরপর দূরে একজনের চেহারা দেখে আবারও আমাকে আতংক পেয়ে বসলো। টিটি–র পুনরাগমনে মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে থাকলাম। টিটি আমাকে একটা জাপানিজ ভাষায় লেখা একটা কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে জানালো (জিহারুর মাধ্যমে জানলাম), আমার রিজার্ভেশন ও সিটের বিষয়ে সে চেক করে দেখেছে যে,

সব ঠিক আছে। তবে কানাজাওয়া স্টেশনে পৌছে যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য সে একটা টিকেট হাতে বানিয়ে এনেছে যা দেখালে স্টেশনে কোনো অসুবিধা হবে না।

স্তম্ভিত আমি বাংলাদেশির মুখে ধন্যবাদ ছাড়া কোনো কথা বের হলো না।

*ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে*

# টয়লেট ও বোরখা

**- মোহাম্মদ মাহেদুল ইসলাম**

**এক.**

১৯৯৯ সালের কথা। এইচএসসি পাস করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছি। সব সময় বাসেই যাতায়াত করি। কারণ ট্রেনে ঢাকা আসা মানেই আরিচা–নগরবাড়ী ফেরিঘাটে জীবন নিয়ে রাত দুই তিনটার সময় একশ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিতা।

একদিন বাল্যবন্ধু বাবলুর খুব অনুরোধের পর ট্রেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। লালমনিরহাট থেকে রাত দশটায় ট্রেনে চড়লাম। কাউনিয়া স্টেশনে নেমে ট্রেন বদলালাম। কারণ লালহাট থেকে শাটল ট্রেন কাউনিয়ায় দিয়ে যায়, এরপর দিনাজপুর থেকে ট্রেন এসে যাত্রীদের নিয়ে নগরবাড়ী ফেরিঘাট মুখে রওনা দেয়।

এগারোটায় ট্রেন এলো। উঠে বসলাম। নগরবাড়ি এসে পৌছালাম রাত দুইটার সময়। জেনে রাখা ভালো, সে সময় যমুনা সেতু চালু হয়নি। বসে আছি ফেরির জন্য। ফেরি তুই কবে আসবি?

রাত দুইটা থেকে ভোর পাচটা পর্যন্ত বসে থাকলাম, ফেরি এলো না। কারণ কি? কারণ ডুবোচরে ফেরি আটকে পড়েছে।

অবশেষে বন্ধু বাবলুর সিদ্ধান্তে জামালপুরে তার বড়লোক খালার তিন তলা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গ্রামের সাধারণ ছেলে আমি। সুতরাং যা বলে তাই করি।

নাশতা খাওয়ার পর বাথরুমের চাপ পেল। বন্ধুকে বললাম।

বন্ধু তার উচ্চবিত্ত খালার বাথরুমে নিয়ে গেল। হয়তো কৌতূহলবশত কিংবা আমার সঙ্গে মশকারা করার জন্যে।

বাথরুমে কেউ ছিল না। সুতরাং ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই চরম আশ্চর্য হওয়ার ঘটনা। ভেতরে আছে *এক.* বাথটাব, *দুই.* কমোড, *তিন.* দুইটি ভিন্ন জলধারা দেয়ার পাইপ (একটি গরম, অন্যটি শীতল) *চার.* প্রায় দশ রকমের সাবান, *পাচ.* সল্প বসনা কিছু নারী–পুরুষের এলবাম, *ছয়.* রকমারি টিশু পেপার। যতো কিছুই থাক, এখন বাথরুম সারবো কোথায়! জীবনে কোনোদিন কমোড ব্যবহার করিনি। তাই না পারছি ঠিক মতো বসতে, না পারছি বন্ধুকে ডাকতে। এক চরম বিব্রতকর পরিস্থিতি।

কমোড নাম শুনেছি। কিন্তু ব্যবহার তো শিখিনি। অবশেষে কোনো রকমে কাজ সেরে উঠলাম।

একটি কথা বলতে ভুলে গেছি, বাথরুমে মেয়েদের বেশ কিছু বাহারি রঙয়ের ক্ষুদ্রাকৃতির পোশাকও ছিল। কোনো রকমে বাথরুম থেকে বের হলাম। এমন সময় খালা এলেন এবং বাবলুকে চরম মাত্রায় বকাবকি করলেন আমাকে সেই বাথরুমে দেখিয়ে দেয়ার জন্য।

কোনো মতে এক রাত থেকে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মাঝখানে ট্রেনের একশ আশি টাকার শোভন চেয়ারের টিকেট টুকরো করে বাসের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। আহ! বাসে কি শান্তি।

আজ ওই খালার কাছে ক্ষমা চাই। খালা, ইচ্ছা করে আপনার বাথরুমে ঢুকিনি। যাযাদিকে ধন্যবাদ দিতে চাই কয়েকদিন আগে *কমোড কিভাবে ব্যবহার করতে হয়* এর একটি বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য। আমার মনে হয় এটির আরো প্রসার ঘটানো দরকার।

**দুই.**

একদিন রংপুর থেকে লালহাট যাচ্ছি বিকাল তিনটার লোকাল ট্রেনে। ছয় টাকা ভাড়া দিয়ে যারা রংপুর থেকে লালহাট যায় তারা জানে লোকাল ট্রেন কি জিনিস! অদ্ভুত ব্যাপার, সবাই মেয়েদের জন্য সিট রাখছে, অথচ ছেলেদের জন্য কোনো মেয়েকে সিট রাখতে দেখিনি। একদিন নয়, কখনোই দেখিনি।

একা বসে আছি সিটের এক-চতুর্থাংশ দখল করে। তিনজনের সিটে বসেছি চারজন, আমি পাতলা মানুষ বিধায় অসুবিধা হয়নি।

চরম গরম, মানুষ, মুরগি, হকার, চেকার, পকেটমার, জোচ্চোর, ফকির, চোরাকারবারী, টিটি, সাইকেল, খড়, তিন তাশের আড্ডা, প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি, সালসা বিক্রেতা, ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন মানুষের এক অদ্ভুত সহআবস্থান এ লালহাট থেকে রংপুর যাতায়াতের লোকাল ট্রেনে। একটু কবিতায় বলি,

*এখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান*

*ছেলে, বুড়ো, হিজড়া, নারী কিংবা দেবোদ্যান।*

আর ওই ট্রেনেরই টয়লেট। ছিঃ ছিঃ, ছিঃ, গন্ধ, প্লিজ, রুমালে নাক চাপা দিন, আস্তে দেবেন যেন নাক ভেঙে না যায়।

সবাই একবার করে টয়লেটে যাচ্ছে আর বলছে, *কোন ছোটলোকের বাচ্চা এ কাজ করেছে?*

সে যাক, বোরখা পরা একটি মেয়ে আমার সামনে বসে বার বার তাকাচ্ছে। কিছু বলছে না, বলতে চাচ্ছে। ওমা, এ দেখি আমারেই দেখে। বলতে শুরু করলো, মিন্টুভাইয়া, কেমন আছেন?

ভালো। কিন্তু আপনি কে?

আমাকে চিনতে পারছেন না?

না তো!

গলার স্বরেও চিনতে পারছেন না?

না।

নেকাব খুলবো?

না, দরকার নেই, এমনিই আপনার নাম বলুন?

এখনো চিনতে পারছেন না?

না।

না চিনলে থাক, চেনার দরকার নেই।

পুরো রাস্তায় সেও নেকাব খুলেনি আর আমিও তাকে চিনতে পারিনি!

বোরখা পরা সকল মেয়েকে অনুরোধ, হয় মুখটা খুলে রাখুন, তা না হলে নিজের পরিচয়টা আগেই দিয়ে দেবেন। না হলে অন্যজনের আপনার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভীষণ সমস্যা হয়।

*জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে*

# বিশেষ তথ্যাবলী

**- মোহাম্মদ সাগর শেখ জীবন**

আমি থাকি বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চল রেলওয়ের সদর দফতর ও বিভাগীয় রেলস্টেশন রাজশাহী সংলগ্ন এলাকায়। আমার জীবনেও রেল ভ্রমণের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। এর মধ্যে বাইরের মেট্রোরেল, মনোরেল, স্কাইরেল থেকে একেবারে শিশু পার্কের *ছোট ট্রেন* পর্যন্ত যার প্রায় সবগুলো অভিজ্ঞতায় ভালো মন্দ মিশিয়ে। কিন্তু আজ ওই সব কিছু না লিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য কিছু তথ্য লিখলাম।

*এক.* বাংলাদেশ রেলওয়েতে চব্বিশ ঘণ্টাওয়ারী সময় রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ মধ্য রাত বারোটাকে ০০ ঘটিকা ধরে দুপুরে বারোটাকে তেরো ঘটিকা হিসাবে গণনা করা হয়।

*দুই.* বিভিন্ন আন্তঃনগর ট্রেনের বিভিন্ন শ্রেণীর যথা – *তাপানুকুল, প্রথম, শোভন* ও *সুলভ* শ্রেণীর ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। এসব ট্রেনের ব্যবহৃত চিহ্নগুলো অবশ্যই যাত্রীদের জানতে হবে। যেমন J তাপানুকুল শ্রেণীর (স্লিপার), j তাপানুকুল শ্রেণী (আসন), F প্রথম শ্রেণী (আসন), E শোভন শ্রেণী, S দ্বিতীয় শ্রেণীর (স্লিপার), Y সুলভ শ্রেণী, IC আন্তঃনগর ট্রেন, M মেইল ট্রেন, X এক্সপ্রেস ট্রেন, D ট্রেনে খাবার গাড়ি আছে, ছা: – ট্রেন ছাড়ার সময়, পো: – ট্রেন পৌছার সময়, ↓ ট্রেন যেদিকে যাবে।

*তিন.* আন্তঃনগর এবং মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের তাপানুকুল ও প্রথম শ্রেণী স্লিপার ও সিটের ভাড়ার পার্থক্য আছে। সিটের ভাড়া স্লিপারের ভাড়ার থেকে পচিশ শতাংশ কম।

*চার.* সাতশ সিরিজের ট্রেনগুলো আন্তঃনগর এক্সপ্রেস। এই ট্রেনগুলো ভ্রমণের আগে আসন সংরক্ষণ অত্যাবশ্যকীয়।

*পাচ.* ইচ্ছা করলে ভ্রমণের সাত দিন আগে টিকেট সংগ্রহ করা যায়।

*ছয়.* প্রারম্ভিক স্টেশনে আন্তঃনগর ছাড়ার পাচ মিনিট আগে ট্রেনের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, তাই আগেই আসন গ্রহণ করা উচিত।

*সাত.* বেশ কিছু স্টেশনে যাত্রীদের জন্য রিটায়ারিং রুমের সুবিধা আছে। স্টেশনগুলো – ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর।

*আট.* যাত্রীদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে ট্রেনের গার্ড ও স্টেশন মাস্টারের কাছে বইতে তা লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

এছাড়াও ঢাকা–চট্টগ্রাম রুটে কিছু আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। ট্রেনগুলো হলো *মহানগর প্রভাতী, মহানগর পূরবী, তূর্ণা নিশিথা, পারাবত* (সিলেট), *উপবন* (সিলেট)। এসব ট্রেনে (২৬"×১৪"×৯") ইঞ্চি মাপের সুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি প্যাসেঞ্জার কোচে নেয়া যায়। বড় হলে ট্রেনের সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে লাগেজ ভ্যানে বহনের জন্য দিতে হবে। শনাক্তকরণের সুবিধার্থে যাত্রীদেরকে লাগেজ ট্যাগ দেয়া হয়। এসব ট্রেন ভেস্টিবল করিডোর দ্বারা যুক্ত। প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনে খাবার গাড়ির ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য উচ্চ শ্রেণীর রেস্টুরেন্ট কারে স্ন্যাকস, বইয়ের দোকান থাকে। যে সমস্ত ট্রেনে খাবারের গাড়ি সংযোজিত থাকে না সেই ট্রেনে ভ্রমণরত উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের অনুরোধে খাবারের প্রয়োজন হলে গার্ড তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

বিছানা সরবরাহ করা হয়। তাপানুকুল ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের অনুরোধে গার্ড, কন্ডাক্টর গার্ড রাতে নির্দিষ্ট স্টেশনে যাত্রীদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে পারেন। মার্জিত রুচির যন্ত্র সংগীত পরিবেশন করা হয়, পাবলিক অ্যাডড্রেস সিসটেমের মাধ্যমে বিশেষ তথ্যাদি প্রচার করার পাশাপাশি ট্রেন ছাড়া ও গন্তব্যে পৌছার সময় আগেই জানানো হয়। রিটার্ন টিকেটও বিক্রয় হয়। যদি আধা ঘণ্টার বেশি দেরি হয় ট্রেন ছাড়তে তাহলে চাহিদা অনুযায়ী টিকেটের পূর্ণ মূল্য ফেরত দেয়া হয়।

প্রতিটি কোচে একজন এটেনডেন্ট, ট্রেনে একজন ট্রেন সুপারিনটেন্ডেন্ট ও একজন কন্ডাক্টর গার্ড, বেশ কিছু জিআরপি ও রেল নিরাপত্তা বাহিনীর লোক যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত থাকে।

আন্তঃনগর ট্রেন সপ্তাহে একদিন বন্ধ থাকে এবং নামাজের সময় আজান দেয়া হয়।

এছাড়াও ট্রেন ভ্রমণের অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে। আশা করি সেগুলো অন্য কোনো পাঠক-পাঠিকা বা লেখক-লেখিকা লিখবেন।

*শিরোইল কলোনী, রাজশাহী থেকে*

# বিয়োগান্তক

**- জয়**

টক, ঝাল, মিষ্টি অভিজ্ঞতার বিচিত্র সমন্বয়ে প্রয়োজনে, শখে দেশ-দেশান্তরে অসংখ্যবার ট্রেন ভ্রমণ করেছি। আমার পছন্দের যুৎসই পরিবহনের তালিকায় নৌযানের পরেই সঙ্গত কারণে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দময় যাতায়াতে ট্রেনের অবস্থান।

পুরো আশির দশক জুড়ে স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ খেদাও আন্দোলনের সুতিকাগার ইউনিভার্সিটির প্রতি ছিল তার শ্যেন দৃষ্টি। তাই আন্দোলন দানা বাধার মতো উপক্রম দেখা গেলেই *এরশাদ ভেকেশন, রওশন ভেকেশন* নামে অহেতুক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে নিজের গদি নিরাপদমুক্ত রাখতে এরশাদ সচেষ্ট হতো।

এ দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে তীব্র সেশন জটের বীজ মূলত এরশাদশাহী প্রোথিত করে গেছে এবং তার পতন পরবর্তী গণতন্ত্রের লেবাসধারী সরকারগুলোর সময় তা ডালপালা বিস্তার করে।

হঠাৎ করে কড়া নোটিশে সে সময় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রাবাস ছাড়তে হতো। এতে করে দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, হয়রানি পোহাতে হতো।

তখন ঢাকা শহরে আমাদের তেমন কোনো আত্মীয় ছিল না বলেই চলে। তাৎক্ষণিক ক্লাস বন্ধ হলে এক বন্ধুর বাসায় বিরতি দিয়ে দম নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতাম। এভাবে বন্ধুটির পরিবারের সঙ্গে পারিবারিক নৈকট্য গড়ে ওঠে।

অজানা-অচেনা পরিবেশ ঘুরে-ফিরে দেখার অদম্য আগ্রহ, কৌতূহল আমার সেই ছোটবেলা থেকেই। তাই পরিচিত কেউ নতুন কোথাও যাবার প্রস্তাব করলে কালবিলম্ব না করে লুফে নিতাম।

একবার এক অখণ্ড অবসরে বন্ধুটির পারিবারিক ইচ্ছাতে ওদের মফস্বল শহর পরবর্তীকালে রূপান্তরিত জেলা সদরে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। বিড়ম্বনা একটু বেশি হলেও রেলপথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সে সময় দেশের মূল ভূখণ্ড রাজধানী ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ অবকাঠামো সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন ছিল। রেল যোগাযোগ ছিল ভরসা। ঢাকা কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট নেমে রেলের পূর্বনির্ধারিত ফেরি-লঞ্চে উঠে যমুনা নদী পার হয়ে অপর পাড়ে গিয়ে ট্রেন পরিবর্তন করে অন্য একটিতে গন্তব্যে যেতে হতো।

নদীর ঘাট সংলগ্ন এলাকা কুলি, মজুর, যাত্রী, পরিবহনের চাপে ছিল মুখরিত। তবে সেদিন ভিড় একটু বেশি ছিল যেন।

আমরা সবাই বয়সে বড় হলেও বন্ধুটির একমাত্র বোনটি ছিল ছোট। হাক-ডাক, ছোটাছুটি, ভীষণ ভিড়, ব্যস্ততার মাঝে জিনিসপত্র নিয়ে লঞ্চে ওঠার সময় বন্ধুটির মায়ের হাত ধরে ছোট বোনটি উঠছিল। এই পথটি আমার সম্পূর্ণ অচেনা। নতুন হলেও ওদের সকলের ছিল বেশ পরিচিত। হঠাৎ বন্ধুটির মা সিড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় পা পিছলে পড়লে ছোট বোনটি ছিটকে লঞ্চ থেকে পানিতে পড়ে যায়।

দুর্ঘটনাটি ঘটে যায় এক মুহূর্তের মধ্যে।

আর্তনাদ, আহাজারিতে ঘাট সংলগ্ন এলাকা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে।

বিশাল যমুনা থেকে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও বোনটিকে আর জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সেই হৃদয়স্পর্শী দুর্ঘটনাটি উপস্থিত মানুষকেও ভীষণভাবে স্পর্শ করে। পারিবারিক সকলের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। সেদিন এক অপ্রতিরোধ্য পাগলিনী মাকে সামাল দেয়া কি যে কঠিন ব্যাপার ছিল!

এরপর থেকে ওই পরিবারের কেউ কোনোদিন ট্রেনে যাতায়াত করে না। সময়ের স্রোতে তারপর নানান চড়াই পেরিয়ে ওদের সঙ্গে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ চমৎকার সম্পর্ক এখনো অটুট রয়েছে। যমুনা নদীর উপর সেতু তৈরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময় আমার প্রবাসে অবস্থান জীবিকার তাগিদে। তারপর দেশে এসে ব্যস্ততা ও পরবর্তীকালে বেশ কিছু সময় শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেতুটি দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

গত বছর আমার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই ওদের পীড়াপীড়িতে সেতু বেড়াতে রওনা দিই। এর আগে বিদেশে একাধিক দেশের অনেক নয়নাভিরাম সেতু দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

সেদিন বাসে করে সেতু পার হবার সময় দুচোখ ভরে নিজ দেশের সবচেয়ে বড় সেতুটির নির্মাণ শৈলী উপভোগ করতে করতে চলছি। হঠাৎ সেতুর মাঝ পথে গিয়ে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, এই সেতুটি আরো বিশ বছর আগে তৈরি হলে বন্ধুটির বোন নীলিমাকে সেদিন হারাতে হতো না।

প্রসঙ্গটি আমার অবচেতন মনের হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও নিমিষে বন্ধুটির হাসি-খুশি, প্রাণবন্ত মায়ের সুখায়ব বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। পাশাপাশি সিটে নানামুখী আলোচনার মধ্যে আনন্দঘন পরিস্থিতিতে আমাদের যাত্রা চলছিল। এরই মাঝে ছন্দপতন।

উপলব্ধি হলো, স্মৃতি রোমন্থনে ভদ্রমহিলার হৃদয়ের ক্ষতে যেন দাবানল জ্বেলে দিলাম। পুরনো শোকের দাহ নিয়ন্ত্রণ কঠিন। শোক ও সান্ত্বনার ভাষা খুজে পাওয়াও বেশ কঠিন।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতিতে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হতে থাকে।

আমাদের একমাত্র কন্যাটির বয়স দেড় বছর। তার অমঙ্গলজনক সামান্যতম কোনো ইঙ্গিত চোখে পড়লেই অন্তরাত্মা কেপে ওঠে।

এক রকম অর্থহীন যাওয়া-আসার মাঝে উপলব্ধি করি যমুনা সেতু তৈরির ফলে যোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবস্থা। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দেশের বিভিন্ন প্রান্তরের সঙ্গে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। স্বল্প সময়ে যাতায়াতে, মালামাল পরিবহনে কষ্ট লাঘব জনজীবনে স্বস্তি এনেছে। কৃষি, ব্যবসা, কর্মসংস্থানে অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ট্রেন চলছে না থেমে।

যমুনা সেতুর চমৎকার নির্মাণ কারুকাজ প্রতিনিয়ত দেশি-বিদেশিদের মুগ্ধ করে। কিন্তু আমার বন্ধুর মা এই সেতু দিয়ে পারাপার হওয়ার সময় নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে।

*পূর্ববাড্ডা, ঢাকা থেকে*

# এনিমি

**- আশিক- বিন মাহমুদ**

বৃষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ হয়। রেলস্টেশনের পেছনের পিচঢালা পথটাতে জমে থাকা বৃষ্টির পানি মাড়িয়ে বাস, ট্রাক শা শা করে ছুটে চলছে। এমন বর্ষার দিনে কক্সবাজার যাবার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি আমি আর বন্ধু মারুফ। বর্ষার দিনে বঙ্গোপসাগর কেমন রূপ নেয় তা দেখার ইচ্ছাটা আমাদের দুজনেরই।

রাত সাড়ে দশটায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া মেল ট্রেন। হেডলাইটের আলো জ্বেলে হর্ন বাজাতে বাজাতে এয়ারপোর্ট রেলস্টেশনের দিকে আসছিল। যাত্রীরা কার আগে কে উঠবে সে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ট্রেন এসে স্টেশনে পৌছাতেই আমরা দুজনে দ্রুত উঠে পড়লাম একটি বগিতে।

খালি সিটে বসলাম দুজনে। সিট পাবো এ আশা করিনি। লোকাল ট্রেন বা মেল ট্রেনে টিকেট কেটেও সিট পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। অনেকটা ইচ্ছা করেই এ মেল ট্রেনের টিকেট কেটেছি। একটু বিলম্বিত ভ্রমণ, একটু বাড়তি আনন্দ উপভোগ করার আশা নিয়েই মেল ট্রেনে যাওয়া।

ট্রেন ভ্রমণ আমার প্রিয় ভ্রমণ। শুধু আমার বললে বোধহয় ভুলই হবে। আমার ধারণা, শতকরা আশি ভাগ লোকেরই ট্রেন ভ্রমণ প্রিয়।

আমার একটি আজব স্বপ্ন আছে। স্বপ্নটা হলো, সুদূর লিবিয়া থেকে গৃস পর্যন্ত ট্রেন ভ্রমণ করে যাওয়া। স্বপ্ন আদৌ পূরণ হবে কি না তা খোদাই ভালো জানে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। পূর্ণিমার চাদ উঠেছে আকাশে। মারুফ ঘুমে বিভোর। আমি পেছনে ফেলে আসা গাছ–গাছালি, ধান ক্ষেত, পাহাড়ের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে করতে যাচ্ছি।

হঠাৎই মারুফ ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাড়ালো।

বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, দোস্ত, কি হয়েছে? দুঃস্বপ্ন দেখেছিস নাকি?

মারুফ বললো, আমার পাছায় কে যেন ইনজেকশন মেরেছে।

ওর কথা শুনে আমার হাসি থামাতে পারছি না কিছুতেই।

মারুফ সিটে বসতে বসতে বললো, আমার এ বিপদের কথা শুনে হাসছিস। মনে রাখিস, এরপর থেকে আমি আর তোর সঙ্গে কখনো আসবো না।

আবার হাসলাম।

খানিকপর আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

সকাল আটটায় আমরা বটতলী রেলস্টেশনে গিয়ে পৌছালাম। ট্রেন থেকে নেমে নাশতা সেরে আমরা ইকবাল বোর্ডিংয়ের তিন তলার তেইশ নাম্বার রুমে গিয়ে উঠলাম।

প্যান্ট, শার্ট পাল্টে ঘুমোতে গেলাম দুজনে। ঘণ্টা খানেক ঘুমানোর পর হঠাৎই টের পেলাম মারুফ জ্বর আর মাথা ব্যথায় বিছানায় ছটফট করছে।

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে তার কপালটা খানিকক্ষণ টিপে দিলাম। বাথরুম থেকে এক বালতি পানি আর মগ নিয়ে এসে তার মাথায় পানি ঢাললাম কিছুক্ষণ। মারুফের অসুস্থতা দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল আমার। ভ্রমণটাই যেন মাটি হয়ে গেল আমার।

মারুফের মাথায় পানি ঢালা বন্ধ করলাম।

সে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে রুমের বাইরে গিয়ে এক লোকের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় হবার পর জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কতো নাম্বার রুমে উঠেছেন?

এই তো উনিশ নাম্বার রুমে উঠেছি।

কার সঙ্গে কথা বলছে দেখার কৌতূহল জাগতেই রুমে বাইরে এলাম। বাইরে এসে ত্রিশোর্ধ বয়সের হ্যাংলা–পাতলা গড়নের লোকটাকে দেখে খুব একটা সুবিধার মনে হলো না। মারুফের হাতের কব্জি চেপে ধরে রুমে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটা কে?

মারুফ বললো, আরে চিনিস না ওনাকে। ওনার নাম কালুভাই। আমরা ট্রেনের যে সিটটাতে বসেছি, তিনি তার পেছনের সিটে বসে এসেছেন।

বললাম, থাক। ভ্রমণ করতে এসে যার তার সঙ্গে পরিচয় হওয়াট ঠিক না।

মারুফ বললো, কালুভাই খুব ভালো মানুষ। তুই এক কাজ কর, নিচে গিয়ে ফার্মাসি থেকে আমার জন্য জ্বর আর মাথা ব্যাথার ওষুধ নিয়ে আয়।

নিচ থেকে ওষুধ নিয়ে এসে রুমে ঢুকে দেখলাম, কালুভাইয়ের উরুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে মারুফ। আর কালুভাই মারুফের মাথায় পানি ঢালছেন।

মারুফের সঙ্গে কালুভাইয়ের এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দেখে সত্যিই অবাক হলাম।

মারুফ বমি করে রুমের মেঝেটা নোংরা করে রেখেছে।

মারুফ আর কালুভাই আমাকে অনুরোধ করলো আবার নিচে গিয়ে স্যালাইন আনার জন্য।

স্যালাইন নিয়ে সিড়ি বেয়ে উঠতে যাবো এমন সময় মারুফ খালি গায়ে ভেজা লুঙ্গি পড়া অবস্থা চোর চোর বলেই বোর্ডিংয়ের কাউন্টারের দিকে এলো। মারুফ হাপাতে হাপাতে বোর্ডিংয়ের স্টাফদের উদ্দেশ্যে বললো, ভাই, আমার টাকা সব চুরি করে নিয়ে গেছে কালু হারামজাদা।

দ্রুত উপরে উঠে দেখলাম কালুভাই তার রুমের বাইরে সানশেটের ওপর মারুফের মানিব্যাগ ছুড়ে ফেললো। এদিকে বোর্ডিংয়ের স্টাফরা লাঠি হাতে ওপরে উঠেই জিজ্ঞাসা করলো, চোর কে?

মারুফ কালুভাইকে দেখিয়ে দিতেই রুম বয় তার হাতের লাঠি দিয়ে কালুভাইয়ের পাছায় দুই তিনটি বাড়ি দিয়ে বললো, ... *পোলা, অ্যাডে চুরি করার লাইনি আইছত। টাকা কই টাকা, বাইর কর।*

আমি সানশেডের ওপর থেকে টাকা এনে মারুফের হাতে দিলাম।

তারপর স্টাফরা কালুভাইকে হালকা উত্তম মাধ্যম দিয়ে বোর্ডিং থেকে বের করে দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

মারুফ বললো, বুঝলি রাসেল, এই লোকটার কারণে অসুস্থ হয়েছি। এ লোকটাই ট্রেনে আমার পাছায় ইনজেকশন মেরেছিল। এগুলোকে কি বলে জানিস?

না সূচক মাথা দোলালাম।

মারুফ বললো, এগুলোকে বলে *ট্রেন এনিমি।*

ঘটনাটা যদিও দুঃখের। কিন্তু মারুফ এমনভাবে বলেছিল কথাটি যা শুনে না হেসে পারিনি।

*চাটখিল, নোয়াখালি থেকে*

## শীতের রাতে একদিন

**- আমিনুল ইসলাম**

রাত দশটায় বন্ধু রায়হানের আমন্ত্রণ পেলাম। পরদিন সকাল দশটার মধ্যেই সিলেটে যেতে হবে। ওদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হাতেও সময় তেমন একটা নেই। বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে যে করেই হোক, যেতেই হবে। রাতের বেলায় একা জার্নি করা খুবই কষ্টকর। তার ওপর শীতের রাত! তাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবদুল লতিফ, আলী আজ্জম ও আবু বকরকেও সিলেট যাত্রার সঙ্গী হতে আমন্ত্রণ জানালাম।

রাত সাড়ে এগারোটায় কুমিল্লা রেলস্টেশনে উপস্থিত হয়েই দেখি ওরা তিনজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সময়টি আজ থেকে বিশ বছর আগের। সে সময় রাতের বেলায় একমাত্র *মেল ট্রেন* ছাড়া সিলেট যাবার অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

রাত সাড়ে বারোটার দিকে *জালালাবাদ এক্সপ্রেস* কুমিল্লা প্ল্যাটফর্ম স্পর্শ করে। আমরা দ্রুত উঠে পড়ি। সৌভাগ্যক্রমে সিটও পেয়ে যাই।

রাতের আধারে গতি নিয়েই ট্রেন চলছে। বগির ভেতরে আমাদের হই হুল্লোড়ে অনেক যাত্রীর ঘুমের ডিস্টার্ব হলেও আমাদের আকর্ষণীয় আলাপচারিতায় প্রায় সবাই বেশ আনন্দ পাচ্ছিল।

আখাউড়া স্টেশনে গিয়ে বড় একটা বিরতি পড়ে।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মধ্যে ট্রেনের আসা–যাওয়া, হকারদের চিৎকার এবং ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান যাত্রীদের আনাগোনা ছাড়া তেমন কোনো তৎপরতা নেই। এমনি নির্জন রাতের বেলায় আমরা এক সঙ্গে চলছি। সত্যিই জীবনের অন্যতম সেরা আনন্দময় মুহূর্ত।

আড্ডার পাশাপাশি ছোটবেলার স্মৃতিও রোমন্থন করছিলাম। বিশেষ করে কয়লার ইঞ্জিনের হুসহাস আওয়াজের স্মৃতি সত্যিই ভোলার নয়।

যাই হোক। সিলেটের উদ্দেশ্যে আবার আমাদের মেল যাত্রা শুরু করে। জানালা খুলে বাইরে তাকাতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই *মীরাসানী পলিটেকনিক একাডেমি* সাইনবোর্ডটি আমাদের নজরে এলো। অবশ্য বাইরের তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস থাকায় জানালা বন্ধ করে দিই সঙ্গে সঙ্গেই।

এক পর্যায়ে শাহজিবাজার স্টেশনে এসে ট্রেন থেমে পড়ে। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি এবং জাগরণের কারণে মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘণ্টা দুয়েক পর জেগে দেখি ট্রেনটি ওই স্টেশনেই থেমে আছে। আমাদের ধারণা, নিশ্চয়ই কোনো গোলযোগ হয়েছে কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের মাঝে সিলেট পৌছার ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাও বাড়ছে।

অল্প কিছুক্ষণ পর মাইকে ফজর নামাজের আজান শুনতে পেলাম। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আজান শুনে আমাদের দুই বন্ধু ট্রেন থেকে নেমে ওজু করে এলো। ওরা ফিরে আসার পর আমরা ওজু করতে গেলাম। কারণ আমরা যাচ্ছি হযরত শাহজালালের স্মৃতিবিজড়িত সিলেটে।

ওজু শেষ করে আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। তখনো অন্ধকার কাটেনি। খুবই চমৎকার লাগছিল। পাহাড়ি সবুজ দৃশ্য। সামান্য দূরে পাওয়ার হাউসের আলো পরিবেশের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমরা মুগ্ধ নয়নে দৃশ্য দেখছি।

হঠাৎ ট্রেনের হুইসল শুনে সংবিৎ ফিরে পেলাম। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। প্রাণপণ দৌড়ে আমরা চলন্ত ট্রেনের নাগাল পেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ট্রেনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কনকনে শীতের মাঝে তীব্র গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে।

আমরা দুটো প্রাণী এক হাতে ট্রেনের দরজার হাতল ধরে অন্য হাতে দরজায় ধাক্কা, ডাকাডাকি এবং চিৎকার করছিলাম। কিন্তু সবই ব্যর্থতার পর্যবসিত হচ্ছিল। আমাদের সমস্ত তৎপরতা ট্রেনের আওয়াজের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

দুজনেই শীতে কুকড়ে যাচ্ছি। হাত পা আস্তে আস্তে বরফ হয়ে আসছে। ট্রেনটি কখন কোথায় থামবে কিছুই জানি না। কি করবো। ভেবে পাচ্ছিলাম না। অজানা আশংকায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছি।

বুদ্ধিমান আবদুল লতিফ ওর গায়ের চাদর খুলে এক হাতেই আমাদের দুজনকে ট্রেনের দরজার রডের সঙ্গে বেধে ফেলে। ওর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করার ভাষা সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি।

শেষ পর্যন্ত আমাদের টেনশনের ইতি ঘটিয়ে ট্রেন গিয়ে থামলো শায়েস্তাগঞ্জ।

আমরা বগিতে ঢুকতেই বাকি দুই বন্ধুর অস্থিরতারও অবসান ঘটলো।

আমাদের মনে হলো, এই বুঝি মৃত্যুর উপত্যকা থেকে ফিরে এলাম। এখন নতুন চিন্তা দেখা দিল সকাল দশটার মধ্যে সিলেটে পৌছার ব্যাপারে।

ট্রেনের যাত্রীদের পরামর্শে শ্রীমঙ্গলে নেমে সড়কপথে সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যেই সিলেটে পৌছে যেতে সক্ষম হই।

রায়হানের মতো অকৃত্রিম বন্ধুর সাহচর্যে আমরা আলী আমজাদের ঘড়ি, সুরমা নদী, হযরত শাহজালালের দরগাহ, হযরত শাহপরাণের মাজার, এমসি কলেজসহ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে নিই। এবং সর্বোপরি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নির্মল আনন্দের মাঝে দুটো দিন কাটিয়ে বাড়িতে ফিরে আসি।

*ঠিকানা বিহীন*

# ভাগ্য

**- মাসুম আহমদ**

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। খুব সম্ভবত সেটা ছিল ১৯৯৮ সাল। আমি তখন সবেমাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি। তাই তাতে অফুরন্ত সময়, কাজকর্ম খুব একটা নেই।

ঘুম থেকে তখন একটু দেরিতেই উঠতাম, তার উপর তখন ছিল ডিসেম্বর মাস। ঠিক এ মাসেই আমাদের শহর রাজশাহীতে হাড় কাপানো শীত পড়ে। তাই রোদের উষ্ণতা পেতেই হোক আর অলস সময় কাটাতেই হোক, সকাল নয়টায় ঘুম থেকে উঠে, চা–নাশতা সেরে রেললাইনের ওপারে (কাদিরগঞ্জ) গ্রেটার রোডের পাশের একটি কনফেকশনারিতে বসে সকাল দশটা থেকে একটানা একটা দুইটা পর্যন্ত আড্ডা দিতাম আমরা কয়েকজন বন্ধু–বান্ধব। বেশ আনন্দেই কাটতো এই সময়গুলো।

সেদিনও বাসা থেকে বের হলাম ঠিক সাড়ে নয়টায়। অন্যদিনের তুলনায় সকালের কুয়াশাটা একটু বেশিই ছিল। আমরা সবাই প্রতীক্ষায় আছি কখন সূর্য উঠবে। কারণ সূর্য উঠলে শীতের প্রকোপ কিছুটা হলেও কমবে। বেলা বাড়তে বাড়তে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। তবুও দিনের প্রথম সূর্যের হাসিটা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হলো না।

এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। কোনো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আরেকটি লোহার ডাণ্ডাকে খুব জোরে ধাক্কা দিলে যেমন শব্দ হয়, শব্দটা ছিল ঠিক তেমনি। তার কিছুক্ষণ পরেই বেলা বারোটার ট্রেনের হুইসল শুনতে পেলাম। আমরা তো ধরেই নিয়েছি, হয়তো বড় ধরনের কোনো ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আমরা সবাই এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে রেললাইনের দিকে তাকাতেই আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা আমাদের কৌতূহলকে আরো বাড়িয়ে তুললো।

এমন বিষয় শুধু হলিউডের বিভিন্ন সিনেমাতেই দেখা যায়।

সেদিনের সেই ঘটনাটি ছিল এ রকম – একটা আস্ত রেলগাড়ি একটা আস্ত শাদা মোটর কারকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও ট্রেনটির সঙ্গে সঙ্গে রেললাইনের পাশ দিয়ে দৌড়াচ্ছি। ট্রেন থামাও! ট্রেন থামাও! বলে চিৎকার করছি। সেই সঙ্গে বিলাপ করছি, ভেতরের লোকগুলো বোধহয় এতোক্ষণে চ্যাপটা হয়ে গেছে। কেউ আর বুঝি বেচে নেই।

তবে ট্রেনটি চলছিল ধীরগতিতে। ট্রেনের চালক হয়তো বা সামনে রেলক্রসিং দেখে গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া ট্রেন স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে সিগানল ডাউন ফেলে কিছু সময়ের জন্য থামানোর একটা নিয়ম রেলওয়েতে চালু আছে।

যাহোক, সেই কারণেই হোক অথবা দৈব কোনো ঘটনার ফলেই হোক, যে সময় ট্রেনটি রোড ক্রসিং পার হওয়া কারটিকে ধাক্কা দিয়েছিল, সেই ধাক্কায় কারটির বামপাশের অংশ দেবে গিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনের পাটাতনের সঙ্গে আটকে যায়। ফলে কারটিকে ঠেলে নিয়ে যেতে ট্রেনটির যেন অসুবিধা হচ্ছিল না। তবে সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনটি সামনের রেল ক্রসিংয়ে কিছু দূরে থাকতেই সিগনাল ডাউন পড়ে যায়। সেই সঙ্গে ট্রেনটিও হঠাৎ করে থেমে যায়। থেমে যাওয়ার ফলেই কারটি ট্রেনের গা থেকে ছিটকে রেললাইনের পাশে পড়ে যায়।

আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম কারের ভেতরে যাত্রীর বেচে আছে কি না তা দেখার জন্য।
আশপাশের ভিড় ঠেলে ভেতরের যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমি বেশ অবাক হলাম।
দুজন মানুষ, পোশাক আশাক দেখেই মনে হলো, একজন গাড়ির মালিক ও আরেকজন ড্রাইভার সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে গাড়ি থেকে নেমে আসছে। তাদের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন মাত্র নেই।
আমি এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। মানুষের ভাগ্য কি তাহলে এমনো হয়! আর সেদিন আবারও অনুভব করলাম সৃষ্টিকর্তার অসীম মহিমা। যদি কারো আয়ু থেকে থাকে, স্বয়ং আজরাইলও পারে না তার জান কবজ করতে। এই ঘটনাটি এখনো মনের অজান্তে হঠাৎই আমাকে ভাবিয়ে তোলে।

*দিলকুশা, ঢাকা থেকে*

# পথের ডাক্তার

– শফিকুল ইসলাম

গন্তব্য রাজশাহী ইউনিভার্সিটি। কারণ ভর্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণ। জীবনের প্রথম গংগানগর থেকে দূরে কোথাও ভ্রমণ। আমার ছোট দুলাভাই যখন বললেন, আমরা রাজশাহী যাবো ট্রেনে চড়ে তখন আমার আনন্দ ধরে না। মনে দারুণ এক শিহরণ। স্বপ্নের ট্রেন থেকে দেখিছি। কিন্তু বাস্তবে ছুয়ে দেখিনি।
কাকডাকা ভোরে রওনা হলাম রাজবাড়ীর উদ্দেশ্য। ওখানে পৌছাতে আমাদের মধ্য বেলা হয়ে গেল। হোটেলে খেয়ে নিলাম। তারপর ট্রেনের হুইসল। রাজবাড়ী থেকে রাজশাহী। ট্রেন যখন ঝুককুর ঝুককুর গতিতে চলছে। এ এক নতুন অনুভূতি!
ছোটবেলা থেকে আমার এক অভ্যাস। বাস, লঞ্চে যেখানেই যেতাম, জানালার পাশের সিটে বসতাম। তাই ট্রেনেরও জানালার পাশের সিটে বসার ইচ্ছা। কিন্তু কোথাও খালি নেই।
আমার দুলাভাই মাঝে বসেই শরীর এলিয়ে দিয়ে ভ্রমণের ক্লান্তিতে ঘুম।
আমার পাশেই মাঝবয়সী এক মহিলা বেশ আয়েশ করে তার কোলের সন্তানকে আদর করছে। চক্রান্ত শুরু করলাম, কিভাবে তাকে উঠানো যায়।
প্রথমে তাকে অনুরোধ করলাম, আপা, আমার বমির সমস্যা আছে, যেকোনো মুহূর্তে বমি করে দিতে পারি। যদি দয়া করে আমাকে জানালার পাশের সিটে বসতে দিতেন তাহলে খুব উপকার হতো।
মহিলা আমার দিকে রুক্ষ নয়নে তাকিয়ে বললেন, ওহ! আমার জোরের ভাই, ওনার আবদার কতো! জানালার পাশের সিট ছাইড়া দেন। ধমকের সঙ্গে বললেন, যেখানে বসে আছো, চুপ করে বসে থাকো।
মনে মনে ভাবলাম, এই মহিলাকে ভদ্র কথায় বাগে আনা যাবে না, তাই বিকল্প চিন্তা শুরু করলাম।
কোনো এক ফাকে গলার ভেতর আঙুল দিয়ে বমির ভান করে তার শরীরের ওপর দিয়ে জানালায় মুখ রাখি। ভাবখানা এমন করি যে, এই বমি করে দেবো। কিছুক্ষণ পর পর এ রকম করা শুরু করলাম।
এক সময় মহিলা তার জানালার পাশের সিটটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, যতো পারো, বমি করো।
ভরা নিঃশ্বাস নিই। কি শান্তি! দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা ট্রেন থেকে গ্রাম দেখা। শেষ বিকেলের ক্লান্তিময় গ্রাম কতো জীবন্ত মনে হচ্ছে। খুব ভাবে বসে দূরের গ্রাম দেখতে লাগলাম।
কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর ওই মহিলার চেচামেচিতে আমার ট্রেন ভ্রমণ মাটি হওয়ার উপক্রম।
খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপা, এমন করে কোকাচ্ছেন কেন?
মহিলা রাগত স্বরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কোকাই কি সাধে! পেটের ব্যথায় মরি আর উনি বলে এমন করছেন কেন?

আমাদের ওষুধের ব্যবসা থাকার কারণে যেখানে যেতাম প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু ওষুধ নিয়ে বের হতাম যেমন জ্বর, বমি, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানা, তুলা, স্যাভলন ইত্যাদি।

ব্যাগ থেকে দুটো পেটের ব্যথার ট্যাবলেট বের করে তাকে বলি, আমার কাছে পেটের ব্যথার ট্যাবলেট আছে, খেতে পারেন।

প্রথমে তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

তাকে খুব করে বোঝালাম, আপা আমি অজ্ঞান পার্টির লোক না।

আমাদের বগির সবাই ওই মহিলার চেচামেচিতে অতিষ্ঠ।

মহিলাকে পাশের সিটের এক ভদ্রলোক বলছে, ছেলেটা এতো করে বলছে, ট্যাবলেটটা খান, তারপর কোনো সমস্যা হলে আমরা তো আছি।

মহিলা ওই ভদ্রলোকের কথা মতো ট্যাবলেট খেলেন।

মিনিট বিশেক পরে সম্পূর্ণ উল্টা প্রতিক্রিয়া হলো। মহিলার ব্যথা না কমে আরো ব্যথার মাত্রা বাড়লো এবং চোখ–মুখে ওলোট–পালোট করছে।

খুব ঘাবড়ে গেলাম।

লোকজন আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

মহিলার চেচামেচিতে বগির সব লোকজন অস্থির হয়ে উঠলো।

এক পর্যায় আমার ওপর কিল ঘুষি পড়া শুরু হলো অজ্ঞান পার্টির লোক বলে।

দুলাভাই আমাকে বাচাতে এলেন। সবাই বলে উঠলো দালাল! দালাল। ধর শালাকে।

তারপরের ঘটনা খুব ভয়ানক। আমাদের ঈশ্বরদী রেলস্টেশনে নামিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হলো। তিন দিন পর ছাড়া পেয়ে ঢাকার বাসে উঠলাম।

*গয়ঘর, পালং, শরীয়তপুর থেকে*